



কৃষ্ণ

মনোজ
বসু



বেথুন পাবলিশিং

১৪, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট
কলিকাতা - ১২

বকুল শারদীয়া বনুমতীতে এই উপস্থাস বেবোষ। সম্পাদকের নিকট পবিত্র পাঠক পাঠিকাব বত যে অভিনন্দন এসেছে, তাব সীমা নেই। বই বেকবাব আগে থেকেই নিউ থায়েটাস সিনেমায তোলবাব ব্যবস্থা কবেন। স্বককাক লাইনা অন্তবেব হুনিগু মূত্রণ। ছই টাকা।

জলজঙ্গল ২য় সং। ‘হুর্গম বাদা অকলেব বিচিত্র প্রাবৃত্তিক পরিবেশ ও অপূর্ব জীবনযাপন পদ্ধতিকে আশ্রয় করিয়া উপস্থাসেব গল্পাংশ গড়িযা উঠিযাছে এবং বাদাবনেব অধিবাসি মূলত প্রেম ও প্রতিহিংসা, দয়া ও দ্বেষাত্ম্য, উপকাব ও উপদ্রব প্রবণ বিপরীতমুখী গটনানুসূহর ঘাত প্রতিঘাতে কাহিনী এমন জমিযা উঠিযাছে যে বিশ্বব ও ব্যাকুলতাব আবেগে বদ্ধ নিশাসে শেষ অবধি গড়িযা বাইতে হয়, সমাপ্তিতে পৌঁছাইবাব পূন নব্য পক্ষে কোথাও দাঁড়াইবাব ছেদ নুঁজিযা পাওয়া যায় না আনন্দবাজা।। চার টাকা।

সৈনিক ৬ষ্ঠ সং। ‘বন্টিষ্ঠ আশাবাদ, নবযুগেব দৃষ্টিভঙ্গি, দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি অবুজিম গভীর অনুবাগ ‘সৈনিক উপস্থাসখানিকে আমাদের জাতীয় সাহিত্যে অনন্ত মহিমায পতিষ্ঠিত করিবে’— যুগান্তব। ৩।।

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଷଦ ଗୋଷ୍ଠୀ

ବନ୍ଧୁବନ୍ଧୁ



প্রথম সংস্করণ—পৌষ, ১৩৫৯
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাঁদ্রয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—জিতেন্দ্রনাথ বসু
দি প্রিন্ট ইন্ডিয়া
৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪
প্রচ্ছদগট-পবিকল্পনা
আম্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক—ফাইন আর্ট টেম্পল
প্রচ্ছদগট-মুদ্রণ
কোটোটাইপ সিঙ্কিট
বাই—বেঙ্গল বাইণ্ডাস
ছাই টাকা

একাকার

মহারাজ মাদুরের উপর মুকুট রেখে হুকো টানছেন।
ঘেসেড়া ঘেসেড়ানী ঘাসের বোঝা নামিয়ে সেই মাদুরে উবু
হয়ে বসে পাখার বাতাস খাচ্ছে। সেনাপতি সতৃষ্ণ চোখে
মহারাজার দিকে চেয়ে আছেন তামাকুর একটুকু প্রসাদের
প্রত্যাশায়।

মহারাজ বলছেন, বাঁচলাম মুকুট নামিয়ে দিয়ে। ধড়ে
প্রাণ এল।

ঘেসেড়া সায় দিল, তা সত্যি। বিষম গরম পড়েছে।
ঘাসের বোঝা মাথায় আমার তো ব্রহ্মতালু জালা করছিল মশায়।

মহারাজ বললেন, জ্বালাতন করছিল ছারপোকায়। মুকুটের
ভাঁজে ভাঁজে কিলবিল করছে।

ইংরেজিনবিস সেনাপতি মন্তব্য করেন, Uneasy lies
the head that wears the crown—

এমন সময় বার্তা এল, লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

হুকো থেকে মুখ তুলে মহারাজ সেনাপতিকে আদেশ
দিলেন, যাও—

সেনাপতি বললেন, দিন একটু—একটা টান টেনে যাই—
মহারাজ দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন, কাজ নষ্ট করে তামাক
টানবে—ইয়ার্কি ? মাইনে খাও না ?

মন-মরা হয়ে সেনাপতি উঠলেন। ভুড়ুক-ভুড়ুক হুকো
টানা ছাপিয়ে গুড়ুম গুড়ুম বন্দুকের আওয়াজ।

কিন্তু মুশকিল, তলোয়ার পাওয়া যাচ্ছে না। দেয়ালে
টাঙানো ছিল, এখন খাপটাই শুধু ঝুলছে। শোনা গেল,
মহামাত্য লিচু-বাগানে গিয়ে তলোয়ার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে লিচু
পাডছেন।

রাজকন্যা মিষ্টি হেসে বললেন, খাপ তো খাপই সই।
কোমরে ঝুলিয়ে নেবেন, খুলতে যাবেন না। লড়াই তো
মুখের তখি। খাপেই দিবিা চলে যাবে।

রাজকন্যার হাতে গুলের কোটা। কথা বলে ফ্যাচ কবে
কালো পিক ফেললেন ঘরের মেঝেয়। আবার নব উত্তমে
দাঁতে গুল ঘষতে লাগলেন।

নাঃ, বড্ড বাড়াবাড়ি ! নেটিভ-প্রিন্সরা বেকার বটে,
কিন্তু রাজা বসে গুড়ুক খান, মহামাত্য লিচু পাড়েন, রাজ-
কন্যা গুল মাজেন—এতখানি নিশ্চয় নয়।

কি সর্বনাশ ! রাজা আব ঘেসড়া এক মাহুরে বসিয়েছেন—
বাশিয়া আমদানি করবেন নাকি এ-দেশে ?

বুঝতে পেরেছি। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান পায়তারা ভাজছে
আসলে খাপ ছাড়া তাদের আর কিছু নেই—এই কথাটা হাবে-
ভাবে বলতে চেয়েছেন আপনি।

লেখক যুহু হেসে বললেন, এক যাত্রাদলের সাজঘবে ঢুকে-
ছিলাম ; অধিকারীর সঙ্গে খাতির ছিল। যা চোখে দেখেছি,
জ্ববহু তাই—একটি কথা বাড়িয়ে লিখি নি। এতটুকু কল্পনা
নেই।

চোর

বিস্ফাচলে গিয়ে নামলাম সকাল আটটায়। একা এসেছি।
স্ত্রীর অশ্বলের ব্যাধি, অনিয়ম এক তিল সহ্য হয় না তাঁব।
পুত্রকন্যা এবং আরও কিছু বাজ-প্যাটারা সহ তিনি পরদিন
এসে পৌঁছেছেন। ঘণ্টা কুড়িক সময় হাতে, এরই মধ্যে
গোছগাছ সারা করে ফেলতে হবে। পাহাড়ের নিচে একটা
কুয়ার জল হজমি বলে সুবিদিত। এক কলসি জল আনিয়ে
রাখতে হবে সেই দু-মাইল দূর থেকে।

স্থানিটোরিয়ামের মালিকটি বিশেষ বন্ধু আমার। চিঠি
লেখা ছিল, ট্রেন থেকে নেমে সর্বাত্রে দেখা করলাম তাঁর সঙ্গে।

বাড়ি ভাড়া করে দিয়েছেন তিনি, একটা চাকরও ঠিক করে রেখেছেন। চাকর বাড়িটা চেনে। চাবি ও মালপত্র নিয়ে পৌঁছলাম সেখানে।

মেঝের ঝাঁটা পড়তেই দম বন্ধ হয়ে এল। এত ধুলো জমে আছে! নাকে-মুখে তখন গামছা জড়িয়ে নিলাম। চাকর ভাওনাকেও দিলাম আর একটা গামছা। কোমর বেঁধে ধুলো ঝাড়তে লেগেছি।

এক ভদ্রলোক এলেন। সৌম্যদর্শন প্রবীণ ব্যক্তি। গলা-খাঁকারি দিয়ে তিনি ঢুকলেন।

এসে গেছেন, বারাণ্ডায় বসে বসে লক্ষ্য করলাম। উই যে সাদা বাড়ি, লাইনের ও-ধারে পিপুলগাছতলায়, আমি ওখানে আছি। ভাল হল, একজন ভাল প্রতিবেশী পেলাম।

একটা চেয়ার ছিল, ধুলোয় ভরতি, ঝাড়া হয় নি এখনও, তারই ওপর চেপে বসলেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত আলাপি। আমি বিরক্ত হচ্ছি মনে মনে, কাজের পাহাড়, গল্প করি কখন? ঠারে-ঠোরে জানালামও সেটা। কিন্তু তিনি আমলে আনলেন না, দীর্ঘ ছন্দে আত্মপরিচয় শুরু করলেন।

লক্ষ্মীকান্ত রায় আমার নাম; পিতা স্বর্গীয় চন্দ্রমণি রায়। আদিবাড়ি বারাসতে, এখন বরানগরে বসবাস। পরশু দিন এসেছি। পূজোর পর এই সময়টায় ভাল এখানে। আরও বার দুয়েক এসেছি, তাই জানি। মাছ মেলে না, মাংস খুব পাওয়া যায়—আর বিলক্ষণ সস্তা। চান করতে গঙ্গায় যাবেন

মশায় । কলকাতার গঙ্গা দেখেন, আর এ-ও দেখবেন । জলের রঙ দেখে ডুবে মরতে ইচ্ছে করে । শ্রোত কি রকম ! যা মেরে মেরে পাহাড় ভেঙে ফেলছে । কিন্তু হলে হবে কি—

সহসা কণ্ঠস্বর অশ্রু রকম হয়ে গেল ; বিরস মুখে তিনি চুপ করলেন । আমি সপ্রশ্ন চোখে তাকালাম তাঁর দিকে ।

সব দিকে ভাল, কিন্তু চোরেব বড় উৎপাত । বেটারা মুকিয়ে থাকে—বাঙালি বাবুরা আসেন—এই সময়টার জন্তে ।

ইতিপূর্বেই সেটা শুনেছি । স্থানিটোরিয়ামের বন্ধু চাকর-টাকে দিয়ে বলেছেন, লোক ভালই হবে মনে হয় । আরও দু-একজনকে দিয়েছিলাম, কেউ মন্দ বলেন নি । তবু চোখে চোখে রাখবেন । এখানকার এই সব লোকদের বিশ্বাস নেই । আমাদের এক-একটা চাকর দশ বছর পনেবো বছর কাজ করছে, তবু পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি নে ।

লক্ষ্মীকান্তবাবুও দেখছি সেই কথা বলেন । অস্বস্তি লাগল । অমিয়া এসে পড়লে যে বেঁচে যাই ! ভারি সতর্ক ও সংসারি, এসে তার সংসারধর্ম বুঝে নিয়ে আমায় অব্যাহতি দিক ।

ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন, ক'টা বাজল বলুন দিকি ? এখানে বাজার আবার এগাবোটোর আগে বসে না । বাজাবে যাব এষ্ট পথে ।

সময় দেখতে গিয়ে বেকুব হলাম । ঘড়ি যথারীতি বন্ধ হয়ে আছে । বললাম, ঘড়ি মেরামতের দোকান আছে এখানে ?

ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন ।—খদ্দের কোথা ? ক'জনের

ঘড়ি আছে এদিগরে, তাই বলুন ? চেঞ্জাররাই যা ছু-দশটা নিয়ে আসে ।

তারপর বললেন, সে যাক গে । কত আর হবে ? দশটা, কি বলেন ? আপনার স্ত্রী এলে নিয়ে যাবেন কিন্তু আমার বাসায় । ওই যে—পিপুলতলার সাদা বাড়ি । স্বামী-স্ত্রী আর ছোটো ছেলে, কোন রকম ঝামেলা নেই । মাস তিনেক থেকে যাব ভাবছি । বিদেশ-বিভূঁয়ে বাঙালিদের মিলেমিশে থাকা উচিত, সেই জন্তে মশায় খোঁজ নিতে চলে এসেছি । বলেন তো আমার চাকরটাকেও না হয় পাঠিয়ে দি । চটপট গুছিয়ে দিয়ে যাক ।

আমি কৃতার্থ হয়ে বললাম, এই তো হয়ে এল । কিছু দরকার হবে না । পুরো একটা বেলা রয়েছে, আর লোক কি হবে ?

না মশায়, বড় ক্লান্ত হয়েছেন আপনি । ঘাম বেরিয়ে গেছে । একটু জিরিয়ে নিন । চায়ের সব ব্যাপার আছে দেখছি—এক কাপ চা খেয়ে নিন বরঞ্চ । চা খেতে খেতে একটু গল্প করা যাবে । এই, কি নাম তোর ? চা করতে পারবি রে বেটা ? স্টোভটা জ্বলে বাবুকে এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়া । হাতটা সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিস ।

আমি বললাম, ও কি করবে ? বসুন, আমিই করছি । ভাওনা, তুই বাবা স্টোভে কেরোসিন ঢাল । ঘরের মধ্যে নয়, বারাণ্ডায় নিয়ে যা । যাচ্ছি আমি ।

স্টোভ খরিয়ে জমানো-দুধ সহযোগে ছ-কাপ তৈরি করে নিয়ে বৈঠকখানায় এলাম। লক্ষ্মীকান্তবাবু দেখি চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগে আমার পকেট-গীতাখানা পড়ছেন। চা এনেছি, হাঁশ নেই। আহ্বান করতে মুখ তুলে এক গাল হেসে বললেন, আমার জন্তো কেন? চা আমি বেশি খাই নে। তা এনেছেন যখন, দিন।

চা খেয়ে আরও কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে বাজারের বেলা হয়েছে বুঝে তিনি উঠলেন। যাবার সময় আবার সনির্বন্ধ অনুরোধ করে গেলেন, সস্ত্রীক যাই যেন তাঁর বাসায়।

অমিয়া এসে গেছে। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। পরের দিন সন্ধ্যায় লক্ষ্মীকান্তবাবুর বাড়ি গেলাম। অমিয়ার এখনও ফুরসৎ হয় নি, একাই গিয়েছি।

শিকল নাড়ছি।—বাড়িতে আছেন?

ক্ষণপরে একজন বেরিয়ে এলেন।

কাকে চাই?

লক্ষ্মীকান্ত রায় মশায়ের এই বাড়ি?

ভীক্ত চোখে তিনি আমার আপাদ-মস্তক বার দুয়েক দেখে নিলেন। বললেন, কি দরকার বলুন তো? চোরের খুব উৎপাত, তাই শোনাতে এসেছেন? বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে, একটু চা খেয়ে নিন—এই তো?

চটে গিয়ে বললাম, বাড়ি পেয়ে যা-তা বলছেন, কেমন

ভদ্রলোক আপনি ? লক্ষ্মীকান্তবাবুকে ডেকে দিন, তাঁর সঙ্গে
জানাশোনা আছে—

সে অধম এই তো হাজির। কিন্তু মশায়কে বাপের জন্মে
দেখেছি বলে তো স্মরণ হয় না। নাম কি আপনার ?

অরীন্দ্রশুন্দর ঘোষ—

সকালবেলা তো আর এক অরীন্দ্রশুন্দর এসে সোনার ঘড়ি
নিয়ে চম্পট দিয়েছেন। রূপোর চেনটা পছন্দ হয় নি বোধ
হয়, সেটা ফেলে দিয়ে গেছেন। কিন্তু আর জুত হবে না। চা
আমি খাব না, দুয়োরেও ডবল-ছড়কো লাগিয়ে নিয়েছি ছুতোষ
ডেকে। নমস্কার, আশুন গে মশায়।

অপমানিত হয়ে বেরিয়ে এলাম। সে মানুষটির দৃপ্তাত
নেই। সশব্দে ছড়কো বন্ধ করলেন।

ফিরে আসতেই অমিয়া বললে, পাঞ্জাবি ঝুলছে, শুধু ঘড়িটা
দেখেছি পকেটে। সোনার চেন কি হল, বাস্তব ভুলে রেখেছ
না কি ?

সশব্দে পরীক্ষা করে দেখি। অতএব সদালাপী গীতাধ্যায়ী
সেই ভদ্রলোকেরই পরিপাটি হাতের ত্রিফা। অচল ঘড়িটা
পছন্দ করেন নি, আমার সোনার চেনে লক্ষ্মীকান্তবাবুর সোনার
ঘড়ি তাঁকে বাজারের বেলার সঠিক নির্দেশ দিচ্ছে।

গয়না

ঘোলের শরবৎ দই আর পাতিনেবু এনে রেখেছিলাম
বাজার থেকে। খাও, শরীর জুড়াবে। ইস্—কি চেহারা করে
এসেছ! আমার কান্না পায়।

কাঠ-কাটা রোদুর—ঘরে বসে বুঝতে পারছ না। মাথা
ফেটে চোঁচির হচ্ছে না, সেইটেই আশ্চর্য।

রোদে রোদে ঘুরবে না, এই বলে দিলাম।

অখিলের কোঁতুক লাগে এই রকম বেহিসাবি আবদারে।

ঘুরব না—তবে কি বাড়ি বয়ে এসে চাকরি দিয়ে
যাবে?

ঘুরে ঘুরেও তো হয় না কিছু। বর্ষা পড়ুক, সৃষ্টি ঠাণ্ডা
হোক, তখন চাকরি খুঁজো। এক বাক্স গয়না আছে তো
আমার! অত ভাবনা কিসের?

অখিল শিউরে উঠে।

তোমার গয়নায় পেট চালাতে হবে? অসম্ভব।

দায়ে-বেদায়ে লাগে বলেই তো গয়না! কোন কাজে
আসবে না তো সোনার বোঝা বয়ে বেড়ানো কি জন্তে?

অখিল উদ্বেজিত হয়ে বলল, জীবন যায় সে-ও স্বীকার—
তোমার গয়না নিতে পারব না ।

সেঁ। করে এক চুমুকে শরবৎ খেয়ে নিয়ে ক্লাস্তিতে সে
শুয়ে পড়ল ।

চোখ বুজে আধ ঘণ্টাখানেক কাটল এমনি । তার পর
উঠে বসে চিস্তিত মুখে অখিল বিড়ি ধরাল । সুরমা আয়নায়
দাঁড়িয়ে উড়ন্ত চুলগুলো ঠিক করছিল । শোখিন মেয়ে—সর্বদা
ছিমছাম হয়ে থাকতে ভালবাসে ।

মুহু হেসে সুরমা বলে, খুব এক চোট ঝগড়া হয়ে গেল
উপরের ফ্লাটের লিলি-দি'র সঙ্গে । লোকে যে কত রকমে শত্রুতা
সাধতে চায় ! ওর বর নাকি রেসের মাঠে তোমায় দেখে এসেছে ।

অখিল বলে, মাঠে নয়—মাঠের পাশে বটতলায় । খিদিরপুরে
একটা কাজের খোঁজ পেলাম । লালদৌঘি থেকে হেঁটে পাড়ি
দেবার সময় জিরিয়ে নিচ্ছিলাম একটুখানি ।

তাই বললাম আমি লিলি-দি'কে । তোর বর রেসে যায়,
সেইটেই প্রমাণ হল এর থেকে । নইলে সে দেখল কি কবে ?
রাগ করে চলে এসেছি । অকথা-কুকথা শুনতে আর কোন
দিন যাচ্ছি না উপরে ।

অখিল নিশ্বাস ফেলে বলে, ছপুরের রোদে মাঠ ভেঙে
লালদৌঘি থেকে খিদিরপুর । ছ-পয়সার বিড়ি সম্বল । ধোঁয়া
ছাড়া কিছু পেটে পড়ে নি । ভুমি শরবৎ তৈরি করে দিলে,
অমৃতের মতো লাগল ।

কাঁদো-কাঁদো হয়ে সুরমা বলে, দেখ তো—ছাই গয়নার বাস
তবু বয়ে বেড়াতে বলো! আমায় ?

কিন্তু অখিল কিছুতে শুনবে না ।

জীবন যাবে, তবু নয় । আমার বোতাম-আংটি রয়েছে—
তাই বন্ধক দেবো । চাকরি হলে ছাড়িয়ে আনা যাবে ।

সুরমারও তেমনি জেদ ।

জীবন যাবে তবু তোমার শখের জিনিষে হাত দিতে দেবো
না । আমার বলে এত গয়না—

চাটুজ্জ-দম্পতি পাশের ঘরের ভাড়াটে । শনিবারে আজ
চাটুজ্জ মশায় সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরেছেন ।
এদের মনোরম কলহ উপভোগ করছেন তাঁরা দরজার
ওধার থেকে ।

চাটুজ্জ-গিন্নি বলেন, শুনছ ? শুনে শেখো । কানের
মাকড়িজোড়া তুমি বেচে দিয়েছিলে, বিয়ের বছরটাও পেরোতে
দাও নি—

চাটুজ্জও বলেন, ছেলেমানুষ বউটি কি বলছে—শোন একটু
কান পেতে । বুড়ো হয়ে গিয়েছ—সেই মাকড়ির শোক আজ
অবধি ভুলতে পারলে না ।

অখিল ঘুমিয়ে পড়লে সুরমা ছুটল উপরতলায় লিলি অর্থাৎ
লীলাবতীর কাছে । সাড়া দিতে লিলি বেরিয়ে এল ।

এই রাত্রে ?

আজকে আবার আংটি-বোতামের বায়না ধরেছে। সব গেছে—শনির দৃষ্টিতে এ ছাঁটিও থাকবে না। ভুই রেখে দে ভাই। কি জানি—তালা খুলে চুরি করে যদি বের করে নেয়। অভ্যাস আছে তো !

তু-চোখে জলের ধাবা বইছে। লিলি তাঁচল দিয়ে মুছিয়ে

য়ে, আর একটা কথা। তোব বরকে বলে গিল্টির
ম ঐ রকম এক সেট গডিয়ে দে ভাই। আমার
ও যেমন গিল্টির গয়নায় বাস্শ ভবিষ্যে বেখেছে,

মোহম্মুদ্ গর

নতুন বাসায় পৌঁছেছি সন্ধ্যার পর। ওরই মাঝে এক নজর দেখলাম স্বামীজিকে। তা-ও কি দেখা গেল স্পষ্টভাবে ? হেরিকেনের ক্ষীণ আলো—এ বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই। খালি পা, বারাণ্ডায় এসে উঠলেন। মীরা তরকারি কুটছিল এ-প্রান্তে, তার পাশে একটা মোড়ার উপর বসে আমি হিসাব ঠিক করছিলাম—মানুষ ও মাল বওয়াবয়িতে মোট কতয় এসে

দাঁড়াল। এমনি সময় স্বামীজি এলেন—মুখ পথের দিকে থাকায় নজর পড়ল। দেখলাম, তাজ্জব ব্যাপার, আসছিলেন ধীর পায়ে অশ্রুমনস্ক ভাবে—মীরাকে দেখে স্থান্দরনের বাঘের সামনে পড়লে যেমন হয়, সেই রকম অবস্থা। অতি-দ্রুত ঘরের ভিতর চলে গেলেন। ছুটে গেলেন বললে ঠিক হয়। খিল এঁটে দিলেন সশব্দে।

খোলার চালের নিচে আর কখনো থাকি নি তো—রাতে ঘুম হয় নি ভাল কবে। বেলা অবধি পড়ে থেকে পুষিয়ে নেবো, কিন্তু সাধ্য কি, ও-ঘরে তুমুল বিক্রমে মোহমুদগর পাঠ হচ্ছে, কা তব কাস্তা কস্তে পুত্রঃ—

মীরার গা টিপে বলি, শুনছ ?

বেশ তো হয়েছে—শুয়ে শুয়ে ধর্মকথা শোনা যাচ্ছে পুণ্য-বানের মুখে—

দুঃখিত ভাবে বললাম, বয়সে ছোট—কিন্তু মুক্তিমাংগে কত এগিয়ে গেছেন ! আমরা হতভাগা পাপ-পঙ্কে পড়ে রইলাম।

উঠে পড়ল মীরা। সকালের প্রসন্ন আলোয় ক্র কুঁচকাচ্ছে সে। অতএব অনর্থ কিছু ঘটাবার মতলব খাটছে। চা ঢালল তিন পাত্রে।

উত্তম আবার চা ধরেছে নাকি ?

উঁহ, সন্ন্যাসী ঠাকুরের—

উনি চা খান, কে বলেছে ?

ছোকরা সন্ন্যাসী—ওরা খায় না আবার কি ?

না, না—জিজ্ঞাসাবাদ না করে পাঠাচ্ছ কেন ? হয়তো চটে যাবেন—

কিন্তু মীরাকে নিরস্ত করব—এমন কি শক্তি ধরি আমি !
চা পাঠিয়ে দিল সে উত্তমকে দিয়ে । ছ-ঘরের মাঝের দরজা—
একদিকে শিকল ও অপর দিকে খিল-জাঁটা । তা সজ্জেও ভাড়াটে
বাড়ির দরজা তো—ফাঁক কিছু থাকবেই । মীরা গিয়ে চোখ
রেখেছে অমনি একটা ফাঁকে ।

চটে যাবেন বলছিলে, এসো, দেখে যাও—

আমারও হাত ধরে টেনে পাশে দাঁড় করাল । সন্ন্যাসী
প্রথমটা বুঝতে পারেন নি, এত জলখাবার ও চা কোথেকে এলো
হঠাৎ । উত্তমের কাছে শুনে নিরাপত্তিতে গলাধঃকরণ করছেন ।
মোহনভোগের এক একটা দলা কত তৃপ্তির সঙ্গে যে জিভে
ফেলছেন, চোখ-মুখের ভাবে তা বোঝা যায় ।

ছুটো দিন কাটল, কিন্তু আলাপ পরিচয় হয় নি সন্ন্যাসীর
সঙ্গে । হবে কখন—বাড়িতে যে সময়টা থাকেন, ঘরের ভিতবে
বসে হয় রান্নাবান্না নয় তো পড়াশুনা করছেন । বেরোবার
সময়টা এমন বিহ্যৎগতিতে রাস্তায় গিয়ে পড়েন যে ধরতে হলে
পিছনে ঘোড়দৌড় করতে হয় দস্তুরমতো ।

কিন্তু মীরার সঙ্গে পারবেন কি করে ! তার বুঝি জেদ চেপে
গেছে, সেই যে তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে পালিয়েছিলেন সেই
ঘটনার পর থেকে । হিজ্রপথে সন্ন্যাসীর ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করল
এই ছটো দিন । তারপর বলা নেই কওয়া নেই ছপূরবেলা

থালায় পরিপাটি করে ভাত বেড়ে বাটিতে বাটিতে বাঞ্ছন সাজিয়ে
নিজে ও-ঘরে গিয়ে ঢুকল। আসন ও জলের গ্লাস নিয়ে উত্তম
পিছনে।

এখানটায় পাত্‌। জল ছিটিয়ে দে। যা ধলো ঘবে—এর
মধ্যে থাকেন কি করে ?

সন্ন্যাসী অতঃপর কথা বললেন।

এসব কেন ?

মীবা বলে, খাবেন সেই জন্তে। আর কেন ? ভয় নেই—
জাতে ব্রাহ্মণ আমরা—নৈকশ্য কুলীন। নিজে বান্না কবি,
বাঁধুনির রান্না উনি খেতে পারেন না।

মজা ভমে উঠল, স্বচক্ষে না দেখে পারা যায় না। বাবাণ্ডাব
দরজা হাঁ-হাঁ করছে, মীবাবা ঢুকবাব সময় খুলে গিয়েছে। সকলের
অলক্ষ্যে সেইখানে গিয়ে দাঁড়াই।

সন্ন্যাসী লজ্জিত ভাবে না-না করছেন। বলেন, কেন কন্ট
কবে এত সমস্ত করে আনলেন ?

একটা মানুষ না খেয়ে মাঝা যাচ্ছে—

ঘাড় ভুলে সন্ন্যাসী ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করেন, কে ?

আপনি—আবার কে ? উত্তরে কি চাপিয়েছেন ? এক ঘটি
জল গড়াবাব মুরোদ নেই—সেই মানুষ সন্ন্যাস নিয়েছেন, তিনি
আবার নিজে রান্না কবে খাবেন ! গা রি-রি কবে—চোখের উপর
দেখতে পারা যায় না।

কিন্তু রাঁধাবাড়া তিনি তো দরজা ভেজিয়ে দিয়েই কবেন।

তা হলে চোখের উপরে হল কি করে ? কিন্তু এত সব প্রশ্নের
তাকত সন্ন্যাসী ঠাকুরের নেই। কোন-কিছু না বলে চুপচাপ
বেকুবের মতো বসে রইলেন।

চান-টান তো ভোরবেলা সেরেছেন। উম্মুনে জল ঢেলে দিয়ে
এবারে খেতে বসুন। দেরি করবেন না, আমার অনেক কাজ।

নিতান্ত গোবেচারা সন্ন্যাসী। মীরার প্রতাপে একটা কথা
ফুটল না মুখ দিয়ে। অশীল স্ববোধ হয়ে ঘটিতে জল গড়ালেন।
পুরো ঘটি উপুড় করলেন উম্মুনে।

মীরা তাড়া দিয়ে ওঠে, নিচু হয়ে ঢালুন। দেখছেন না, ছাই
উড়ছে ?

সন্ন্যাসী যথানির্দেশ উম্মুনের দিকে শির অবনত কবে জল
ঢালতে লাগলেন।

হয়েছে। বসুন খেতে এবার। হাতটা ধুয়ে নিন আগে
ভাল করে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, বসব এক্ষুণি—

তারপর সাহস সঞ্চয় করে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, আপনি যান
তা হলে—

কেন ?

কাজ আছে কিনা বললেন—

খাওয়া হয়ে যাক আপনার। তার পরে যাব।

একখানা টুল টেনে নিয়ে সে বসে পড়ল।

সরাসরি প্রশ্ন, সন্ন্যাসী হয়েছেন কেন ?

মুখ নিচু করে সন্ন্যাসী গভীর মনোযোগে খেয়ে যাচ্ছেন ।

জবাব দিন—

ঈশ্বরের পদাশ্রয়ে পড়ে আছি ।

বুঝলাম । কিন্তু আনাড়ি মানুষ বাইরে বেরিয়েছেন কোন
ভরসায় ? সংসারে কি ঈশ্বর নেই ?

সন্ন্যাসী বাড়ি নেড়ে বিষম আপত্তি জানানলেন ।

আজ্ঞে না । সংসার অতি জঘন্য—পুতিগন্ধময় নরক ।

মীবা বলে, তাই বুঝি কেওড়াতলার শ্মশানে গিয়ে বসেন
মড়ি-পোড়ার সুগন্ধ শুকতে । সে যাক গে । ঘরের দরজা
আজকে খোলা রেখে যাবেন—আপনার স্বর্গধাম একটু সাফ-
সাফাই করব ।

রায় দিয়ে মীরা উঠল অবশেষে । আর, ওর খরদৃষ্টি এড়ানো
সোজা নয় । সন্ন্যাসী যথারীতি তাল দিচ্ছেন—এ-ঘর
খেঁকেই যেন হাত গুণে টের পেয়ে গেল ।

তাল দিচ্ছেন যে ? দামি দামি জিনিষ আছে, নিয়ে সরে
পড়ব—তাই ভেবেছেন ?

বেকুব হয়ে সন্ন্যাসী আমতা-আমতা করেন ।

সে কি কথা ! চাবি আপনার কাছে দিয়েই তো যেতাম ।
এসে পড়েছেন, ভাল হল ।

ঘর ঝকঝকে, জিনিষ ক'টি পরিপাটি ভাবে গুছিয়ে রাখা,
খাওয়াটাও অতি উপাদেয় হচ্ছে—সন্ন্যাসী আর বিশেষ আপত্তি

করেন না। খেতে বসিয়ে একদিন মীরা বলল, আজকে আপনার বই গোছাচ্ছিলাম। কত পড়েন আপনি—বাপ রে! আচ্ছা গীতার ভিতরে ফোটোগ্রাফ রয়েছে—ওখানা কার ?

খতমত খেয়ে সন্ন্যাসী বলেন, স্ত্রীর—

মীরা হেসে ওঠে, স্ত্রীর ছবি বয়ে বয়ে বেড়াচ্ছেন—কি রকম সন্ন্যাস ?

একটু ঈতস্তত করে সন্ন্যাসী বললেন, সত্যি কথা বলি আপনাকে। ওঁরই জন্তু আমি সংসারত্যাগী।

কণ্ঠে গভীর বেদনার সুর। শুনে কষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গ মীরা না তুললেই পারত! আদর্শ প্রেমিক—স্ত্রী নেই, সংসার ছেড়েছেন সেই শোকে! সন্ন্যাসী হয়েও তার ছবি দেশ-দেশান্তর বয়ে বেড়াচ্ছেন।

মীরা সরে গেল। তার মন ভরে গেছে। হয়তো বা চোখের জল গড়িয়ে পড়বে—সেইজন্তু তাড়াতাড়ি চলে গেল সন্ন্যাসীর সামনে থেকে।

খানিক পরে সবিতা এল শ্রামবাজার থেকে। মীরার শৈশব-সান্নিধ্য। আমাদের নতুন বাসা দেখতে এসেছে। অভিভূত ভাব কাটে নি তখনো, সন্ন্যাসীর ব্যাপার সে সবিতাকে বলল। তালা খুলে দেখাল সেই স্ত্রীর ছবি।

ছবি দেখে সবিতা চমকে ওঠে। মরবে কেন—এ তো মন্দা, আমার মাসশাশুড়ির মেয়ে। বর সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, শুনেছিলাম বটে! তিনি এখানে? ঢং...বুঝতে পারলি?

জলজ্যাস্ত বউটাকে ভাসিয়ে দিয়ে এলেন, এখন আবার তার ছবি মাথায় করে বেড়ানো হচ্ছে !

দিন আঠেক পরেব কথা । রাতি প্রহর খানেক হয়েছে । ফুটফুটে জ্যোৎস্না । গুণগুণ করে বোধ করি মোহমুগবই ভাঁজতে ভাঁজতে সন্ন্যাসী বারাণ্ডায় উঠলেন ।

চাবিটা দিন দিদি ।

খোলাই আছে ভাই—

ভাই-বোন হয়ে গেছে ওরা এই ক’দিনে । গুণগুণ কবতে করতে ঘরে ঢুকে সন্ন্যাসী বলে, আলো দাও নি কেন উত্তম ? একটা হেরিকেন·· ওবে, বাবা বে—

মীরা খিল-খিল কবে হেসে বলল, ভয় পেলে ? দেখ না ভাল কবে—বাঘ-ভালুক নয় । মন্দা—তোমাব মন্দাকিনী ।

মাঝ-বাতে ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠে বসলাম । যেন গজকচ্ছপের যুদ্ধ পাশেব ঘরে ।

মীরা সভয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি হল—বল দিকি ?

কি আর হবে । প্রেমালাপ । অনেক দিন পাবে দেখা—মান-অভিমানের পালা চলছে ।

কিন্তু মুখেব আলাপে অমন ছটোপাটি কেন হবে ? বাক্স-তক্তাপোশ যেন আছড়ে আছড়ে ভাঙছে ।

বললাম, দরজায় শিকল দিয়ে এসো বাইরে থেকে । বেড়া

ভেঙে ঠাকুর অনেক দিন বাইরে বাইরে চরে বেড়িয়েছেন—বোধ হয় নিঙে দড়ি নিতে চাচ্ছেন না।

মীরাও তাই সমীচীন মনে করল। পা টিপে টিপে বারাণ্ডায় গিয়ে শিকল দিয়ে এল।

কিন্তু তাতে মানায় না। সকালে উঠে মন্দাকিনী বোমার মতো ফেটে পড়ে।

একটু আমাব ঘুমের আবিল এসেছে, আর সেই ফাঁকে করেছে কি দেখে যান...আচ্ছা, পাই আর একবার কায়দার মধ্যে! হাতে দড়ি, পায়ে দড়ি—কোনরকম আর মায়া-দয়া নেই—

মায়া দেখানো চলে না বটে এ হেন স্বামীকে! করেছে কি—দরজা খুলতে পারে নি তো জানলার শিক খুলে সেখান থেকে পাশের পটা ডোবার মধ্যে লাফিয়ে পড়ে ঐ দিক দিয়ে পালিয়েছে। প্রাণের পরোয়া করে না, সম্ম্যাসে এমন আকর্ষণ।

*

*

*

পরদিন এক পোস্টকার্ড এল মীরার নামে। ঠিকানা নেই—এই কলকাতা শহরের কোন এক স্থান থেকে লিখেছে, ডাকের ছাপে বোঝা যাচ্ছে। লিখেছে—দিদি, এমন বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবেন, স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। শাস্তির বাসা ভাঙিয়া দিলেন। দাম্পত্য-আলাপন নিতান্তই যদি কানে না গিয়া থাকে, ঘরের অবস্থা দেখিয়া বুঝিবেন, কেন এ পথে আসিয়াছি। অস্বীকার করিব না—বয়সের দোষে কিংবা অপরের ঘর-গৃহস্থালী দেখিয়া মাঝে মাঝে মন দুর্বল হয়, সংসারে চুকিতে

ইচ্ছা জাগে। তখন ঐ ছবি বাহির করিয়া মন্দাকিনীকে মনে করি। মোহমুদগরের চেয়ে অধিক কাজ দেয়।

দুই সখী

দুই সখী—মীনা আব অমুরাধা। ঈশ্বর দেহ আলাদা করে দিয়েছেন, কি করবে—এ দুর্ঘটনায় তাদের হাত নেই, কিন্তু হৃদয় অভেদ। বসে পাশাপাশি, সুষোগ পেলেই ফুসফুস গুজগুজ করে। এত কথা কিসেব রে বাপু? কথার মহা-সমুদ্র—সীমা নেই, শেষ নেই। বাড়ি ফিরবে দু'টিতে গলাগলি হয়ে। তখনও কথা। কথার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে হেসে উঠছে

মীনা বলে, আজ আবাব পিছু নিয়েছে—

চিমটি কাটল অমুরাধার গায়ে। সে উঃ—করে উঠল। ফিসফিসিয়ে মীনা বলে, ঘাড় বৌকিয়ে অমনি বুঝি দেখে? তা হলে তো পেয়ে বসবে! ঘাড় ফেরাবি নে, চোখ তুলবি নে—যেমন যাচ্ছি তেমনি চলে যাব পথ ধরে। তবু ওরই মধ্যে দেখে নিতে হবে।

পিছনে বিহুনির ভিতরে একজোড়া চোখ রাখতে হয় তা হলে—

আমি দেখছি কি করে? বলে যাচ্ছি—শোন। ক্রিম

রঙের ট্রাউজার আর বুশার্ট—এক নজরে সামনে চেয়ে হাঁটছে।
আচ্ছা, তোকেও দেখিয়ে দিচ্ছি—

এক বাড়ির গেটে নানা রকম ফুল ফুটে আছে। মীনা বলে, ফুল পাড়। পাড়িস না পাড়িস—সেই ঝাঁকে দেখে নিবি।

অমুরাধা বলে, জব্দ করতে হবে ওটাকে। কি মুশকিল বল তো—

মীনাও সমর্থন করে, এমন শিক্ষা দিতে হবে—কোন মেয়ের কখনও কাছ ঘেঁসতে না আসে।

তাই হল। ঝুমকো-জবা তুলছে—একটু উঁচুতে, ঠিক নাগাল পাচ্ছে না। তা ছাড়া নজরটা অগ্নি দিকে থাকায় হাতেও পৌঁছচ্ছে না ঠিক মতো। তখন এক কাণ্ড হল। কাস্তিভূষণ তীরবেগে ছুটে এসে এক লম্ফে গোটা চারেক ফুল তুলে এগিয়ে ধরে, নিন—

চক্ষের পলকে হয়ে গেল এটা। মেয়েছ’টি হতভম্ব। ফুল হাতে নিয়ে তখন সস্থিত হল অমুরাধার। কুটিকুটি করে জুতোয় মাড়িয়ে দিয়ে গটগট করে পাশের গলিতে বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

মীনাদের বাড়ি আর খানিকটা দূরে। এখন সে একা চলেছে। টের পাচ্ছে, কাস্তিভূষণ আসছে দূরে দূরে। ত্রিয়মান—মুখ নিচু করে ধীরে ধীরে আসছে। তবু ভাল—অপমান একটু তবে গায়ে লেগেছে! গিছনে মুখ ফিরিয়েই মীনা

দেখল—কাস্তির তবু নজর পড়ল না। বাড়ির দরজায় এসে থমকে দাঁড়ায়। কড়া নাড়ছে দরজা খোলার জন্ত, আর রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে।

কাস্তি কাছে এসে সক্রিয় কণ্ঠে বলল, অপরাধটা কি হয়েছিল বলুন তো? ফুল পাড়তে পারছিলেন না, আমি তাই তাড়াতাড়ি—

অপরাধ হল, হাংলার মতো আপনি বড্ড আমাদের পিছন পিছন ঘোরেন।

বাচ্চা চাকরটা দরজা খুলল। জল-কাদা জমে ছিল জায়গাটায়। জুতোর ঠোকরে আচমকা খানিক কাদা ছিটিয়ে দিয়ে মীনা ঢুকে পড়ল। পাট-ভাঙা শৌখিন জামা কাদায় মাখামাখি। মুখে চোখেও এসে লেগেছে।

তবু কাস্তিভূষণ নাছোড়বান্দা।

ক'দিন পরে অনুরাধাকে ট্রামে পেয়ে গেল। বসবার জায়গা নেই—কাস্তি কাছে গিয়ে তার সিটের হাতল ধরে দাঁড়াল।

কত আগ্রহে ফুলগুলো হাতে দিলাম, আপনি জুতোয় চেপটে চলে গেলেন।

অনুরাধা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মনে মনে। জুতোয় তোমার মুণ্ডটা চেপটে দেওয়া উচিত ছিল। এই ট্রাম অবধি তা হলে ধাওয়া করতে পারতে না।

কিন্তু এক-ট্রাম লোকের মধ্যে এ সব বলা যায় না।
অতএব নিরন্তর রইল।

অথচ আপনার বন্ধু মীনা দেবী কত খাতির করলেন আনায়—
জুতো মেরে ?

কিন্তু এ ব্যাপারও প্রকাশ করে বলা চলে না এক
ভদ্রজনের সম্পর্কে।

স্টপে ট্রাম থামলে কান্দি বলল, নমস্কার !

মীনা কি খাতির করল, বললেন না তো ?

না...না—সে কিছু নয়।

একটুখানি বলে ফেলে যেন ভারি অশ্রায় করেছে -
কান্দিভূষণের ভাব এমনি। হাসতে হাসতে বলে, খাতির
করবেন—তবেই হয়েছে ! ছু-জনেই এক রকম আপনাবা।

তাড়াতাড়ি সে নেমে পড়ল। এবং যা ভেবেছে—অমুবাধাও
নামল তার সঙ্গে।

কান্দি আশ্চর্য হয়ে বলে, লেকে যাচ্ছিলেন মনে হল -
ছু-আনার টিকিট করলেন।

আমতা-আমতা করে অমুরাধা বলে, একটা কাজ আছে এই
দিকটায়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

চলতে চলতে প্রশ্ন করল, মীনা জুতোর কাদা ছিটকে
দিয়েছিল না আপনার গায়ে ?

কান্দি বলে, বলেছেন বৃষ্টি ? ঠিক তাই। এমন কাদা
ছিটকালেন, গালে মুখে মাখামাখি। মুশকিল তখন—লোকের

সামনে বেরোই কি করে সে মুখ নিয়ে ? ওঁদেরই কলতলার
সাবানে ধুয়ে তবে বেরুতে পারি ।

অপমানের ব্যাপার বলতে মিটিমিটি হাসে কেন অমন ধারা ?
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে অনুরাধা বলে, গোটা
কয়েক কথা আছে । এখন সময় হবে আপনার ?

কান্দিভূষণ ঘাড় নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে, না । ফুল কিনতে
যাচ্ছি, তার পরে আবার—

তার পবে কি ?

মীনা দেবী চায়ে ডেকেছেন ।

বলেই টোঁক গিলে তাড়াতাড়ি সামলে নিচ্ছে, একলা
আমাকে নয়—অনেককেই ডেকেছেন ।

মুখ ক'লো করে অনুরাধা বলে, আমাকে কিন্তু নয় ।...
তা বেশ, ফুল-টুল নিয়ে যান তবে আপনি—

অপ্রতিভ ভাবে কান্দি বলে, ওঁদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই
আপনার কাছে চলে যাব—

কাজ নেই । মনে তাড়া থাকলে চায়ের আনন্দ
পাবেন না ।

আচ্ছা, নমস্কার—

কান্দিভূষণ ব্যস্তভাবে বিদায় নিয়ে যায় ।

অনুরাধা ডাকল, শুনুন । কালকে একবার সময় হতে পারে ?

কেন হবে না ? আজই হতে পারত চায়ের পরে । ও
বলুন, কোন্ সময় সুবিধে আপনার ?

মনে মনে একটু ভেবে নিয়ে অনুরাধা বলে, সন্ধ্যাবেলা—
এই ধরুন সাড়ে-পাঁচটা ছ'টা—

কাস্তিভূষণ ধরে বসল, সিনেমার পাশ পেয়েছি। সিনেমায়
বসে বেশ কথাবার্তা হবে। আপনি এতে 'না' বলবেন না—

পাশ নাকি শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় নি। টিকিট করেই চুকেছে।
ইন্টারভ্যালে আলো জ্বললে দেখা গেল অদূরে মীনা।

অনুরাধা আশ্চর্য হয়ে বলে, তুমি এসেছ—তা তো টের
পাই নি—

মীনা কটমট করে তাকিয়ে উঠে পড়ল।

অনুরাধা ডাকে, মীনা!

ততক্ষণে সে বেরিয়ে গেছে। কাস্তি তটস্থ হয়ে বলে, আমি
ডেকে আনছি। আপনি বসুন।

বাইরেই-পাওয়া গেল মীনাকে। কাস্তি বলে, আপনার
বন্ধু এত ডাকছেন, শুনতে পেলেন না? আমায় তাই পাঠিয়ে
দিলেন।

আমি যাব না—

মোটাই যাবেন না? টাকা দিয়ে টিকিট করেছেন, ছবির
শেষ দেখবেন না? কিন্তু সিনেমায় আপনিও আসবেন, সে কথা
তো বললেন না—

বললে একখানা বেশি টিকিট করতে বলতেন অন্তর্কে?

তা স্বচ্ছন্দে করতে পারত। পাশাপাশি বসা যেত
তা হলে।

মীনা বলে, আপনার সঙ্গে ওর নতুন জানাশোনা, আমি
ইস্কুলের আমল থেকে জানি। ও যে কি করতে পারে আব
পারে না—সমস্ত আমার জানা।

কাস্তিভূষণ গদগদ হয়ে বলে, যেমন মিষ্টি মন তেমনি দুর্জয়
সাহস! অমন মেয়ে হাজারে একটা দেখা যায় না।

অমন সর্বনেশে মেয়ে আর দ্বিতীয় নেই। টের পাবেন
ক'দিন পরে। আপনি বললেন সিনেমার কথা, কিন্তু বিশ্বাস
করি নি। বুদ্ধিমান মনে করেছিলাম আপনাকে—কিন্তু এত
সহজে খপ্পরে গিয়ে পড়বেন, সে কি বিশ্বাস হবার কথা?

* * * *

পূরবী বলে, বাজি জিতেছ তুমি কাস্তি-দা। দুই সখীতে
মুখ দেখাদেখি নেই। দেখা হলেই হলো-বেড়ালের মতো
কাচ করে ওঠে—

আমার পাওনা?

সত্যি, বিস্তর খরচ হয়েছে তোমার। ছ-খানা সিনেমার
টিকিট আড়াই টাকা, স্ন্যুট কাচানোর খরচ দু-টাকা, দু-হপ্তা
ঘুরে ঘুরে বেড়ানো...। তা হেরে গেছি যখন, সমস্ত দিয়ে দেব।

নিজেকে স্নদ্ধু। এত অপমান সয়েছি—মনে করছ, আটটা
কি দশটা টাকার লোভে?

যাও—

দাঁড়াও তবে। তোমার কে সখী আছে, খোঁজ নিচ্ছি।
আবার এক প্যাঁচ খেলব, তখন আছড়ে পড়তে দিশে পাবে না।

কেষ্টমামা

কেষ্টমামা আসছেন। বুঝলে? ছেলের বিয়ে—ছুটো দিন
থেকে সওদা করবেন। তাঁর জামাই এসে খবর দিয়ে গেলেন।
মামা বুড়োমানুষ, গুদ্বাচারী—মেসের খাওয়া খেতে পারেন না।
তাই বলে গেলেন জামাইবাবু।

চন্দ্রিকা ঘাড় ছলিয়ে বলে, যেতেই বা দেব কেন—আমরা
যখন রয়েছি। আপনার লোক ছুটো দিনের জন্ত এসে যদি
এখানে-সেখানে উঠবেন, তবে আর শহরে বাসা করে রয়েছি
কেন?

ব্রতীন্দ্র জোর দিয়ে বলে, নিশ্চয়—একশ'বার! আমি বলি
কি—দোতলার ঘরের জিনিষপত্র সরিয়ে দিই, এখানে উনি
থাকুন। ডিস্টেন্সার-করা দেয়াল, চারিদিক খোলা—খুশি
হবেন। থাকবেন তো ছুটো দিন—আমরা কষ্টে স্তম্ভে নিচের ঘরে
কাটিয়ে দেবো। কি বলো?

চন্দ্রিকা রাগ করে বলে, কষ্ট আবার কিসের? নিচের ঘর
খারাপ কিসে? কলকাতায় যত নিচের তলার ঘর—সমস্ত বুঝি

খালি পড়ে থাকে, ইঁদুর-আবশুলা কিচকিচিয়ে বেড়ায় ? প্রবীণ ধার্মিক মানুষ—তিনি নিচেয়, আর আমরা উপরতলায় মাথার উপরে হুমদাম করে বেড়াব, তাই কি হতে পাবে কখনো ?

গাড়ি পৌঁছবে আটটা-সাতান্নোর—তার মানে ন'টাই ধবো । এর মধ্যে রাঁধাবাড়া শেষ কবতে হবে, এসেই মখ-হাত ধুয়ে যাতে বসে যেতে পাবেন । পথেব কষ্টে ভো আধখানা হয়ে আসবেন । তাব পরে রান্না চাপাতে হলে অনেক রাত হয়ে যাবে, ক্ষিদেয় কষ্ট পাবেন বুড়োমানুষ—

চন্দ্রিকা পবমোৎসাহে বলে, আমি নিজে রাঁধব । ঠাকুবের রান্না মুখে দিতে পারবেন না কেউমানা । পাতে দেবোই বা কেন সে রান্না ? কত ভাগ্যে বাসায় তাঁর পায়েব ধুলো পড়ছে—

বাজাবে আমি কাল নিজে যাব । জিনিষপত্র দেখে শুনে আনতে হবে, চাকরে পারবে না । ফল আব মিষ্টি-মিঠাই অফিস-ফেরতা নিয়ে আসব ।

অফিস থেকে একটু সকাল-সকালই ফিরল । চন্দ্রিকা এরই মধ্যে পাট-ভাঙা গরদের শাড়ি পরেছে, বোধ করি স্নান হয়েছে আর একবার—এলোচুল পিঠেব উপর ডড়ানো । কে বলবে, রান্নাঘরে যাচ্ছে সে—গুজোব ঘরে যাচ্ছে না ?

তরকারিগুলো নামিয়ে রেখে উলুনে ভাত বাঁসিয়ে চন্দ্রিকা উপরের ঘরে এল, তখন ঠিক আটটা । ত্রতীন মহাব্যস্ত ; বিলাতী মেম, কুকুর নিয়ে নেকড়ে-শিকার—এই সমস্ত ছবি

সিঁড়ির ঘরে চালান করে দিচ্ছে। দেয়ালে এনে টাঙিয়েছে দশমহাবিজ্ঞার ছবি—মা বেঁচে থাকতে যা তিনি আহ্নিকের ঘরের কুলুঙ্গিতে বেঁধেছিলেন।

চন্দ্রিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। বলে, ঠিক হয়েছে—এই ছবি দেখলে খুশি হবেন। স্টেশনে বণ্ডনা হও এবাব। বলা যায় না—ট্রেন অনেক সময় দশ-বিশ মিনিট আগেও এসে যায়।

তৃতীয় বলে, ছবি সবাবাব কথাটা আগে মনে হয় নি। এখনো কাজ কিছু বাকি আছে। তুমি যাও চন্দ্রা, ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাও ধরো, এই প্রথম এ-বাড়ি আসছেন—ট্যাক্সি কর আগে। তোমাদের ফিরে আসতে আসতে তাব মধ্যে ঘবেব কাজ সাবা হয়ে যাবে।

চন্দ্রিকা আপত্তি করে। তা হয় না। সেকলে মানুষ—বাড়ির বউ একা-একা স্টেশনে রিসিভ করতে গেছে, এ তিনি ভাল চোখে দেখবেন না। তার চেয়ে তুমি চলে যাও—সাজানো-গোছানো আমি সেবে ফেলব তত্ত্বক্ষেণে।

তৃতীয়ও ভেবে দেখল, কথা ঠিক বটে! চন্দ্রিকা চট কবে কেমন সব ধবে ফেলে। বলল, দু-জনেই যাই তা' হলে। তাতে বেশি খুশি হবেন মামা। ঘর একটু জবড়জং হয়ে রইল—তা হোক গে, কেউমামা তো পব নন।

প্লাটফরমে অপেক্ষা করছে। গাড়ি ঢুকছে স্টেশনে—কুলিরা উঠে দাঁড়াল। অনেকেই আত্মীয়জনকে নিতে এসেছে।

গাড়ির কাছে ছুটে গিয়ে প্রতিটি জানলা লক্ষ্য করছে তারা। গাড়ির দিকে এদেরও নজর, কিন্তু ত্রতীনের বেশি নজর চন্দ্রিকার দিকে। আবার চন্দ্রিকাও অনলক্ষ্যে ত্রতীনের দৃষ্টি অনুসরণ করছে।

লোকজন নেমে তিনটে শ্রোতের মতো তিন দরজা দিয়ে বাইরে চলল। চন্দ্রিকার কলেজের বন্ধু একটি মেয়ে নামল, কথা বলছে সে তার সঙ্গে। ভিড় বেশ পাতলা হয়েছে।

এমনি সময় ধীরে-সুস্থে এক বুড়ো নামলেন ইন্টার-ক্লাস থেকে। গায়ে নামাবলী; চেহারায় লালিত্য আছে। একটু ইতস্তত করে ত্রতীন এগিয়ে গেল। দেখা গেল, চন্দ্রিকাও একরকম ছুটে আসছে বন্ধুকে ফেলে। অতএব ইনিই হলেন কেঁটমামা।

ত্রতীন গড় হয়ে বুড়োব পায়ে প্রণাম করল। চন্দ্রিকাও পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিল।

ভাল আছেন মামা ? এইদিকে—গাড়ি এই গেটের কাছে—
বুড়ো ক্রকুটি করলেন তাদের দিকে। অল্প আলোয় বই পড়ার মতো করে একবার ত্রতীনের মুখে একবার চন্দ্রিকার মুখের কাছে ঝুঁকে দেখছেন।

ত্রতীন বলে, চিনতে পারলেন না ? আপনাদের চন্দ্রিকা।
তা স্টেশনের যে রকম আলো, ঠাইর করতে না পারলে দোষ নেই কিছু।

চন্দ্রিকা ফিসফিস করে বলে, আমার নামে চিনতে না-ও পারেন—তোমার নিজের কথা বলো।

বর্ষায়ান আত্মীয়ের কাছে স্বামীর নাম মুখে আনতে সঙ্কোচ হচ্ছিল—কি জানি, কি মনে করবেন ! কিন্তু তৃতীয় যে কিছুতেই বলছে না—তার উপর রাগ করে এবং মরীয়া হয়ে চন্দ্রিকাই শেষ পর্যন্ত বলল, আপনার ভাগ্নে তৃতীয় রায় আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছেন ।

চোখে ভাল না দেখলেও বুড়োব কান খুব তীক্ষ্ণ, বুঝতে পারা গেল । পিছনে কোন অলক্ষ্য ব্যক্তির উদ্দেশে হাঁক দিয়ে উঠলেন, ও নফরা, কোথায় পিছিয়ে পড়লি বে হারামজাদা ? কি বলছে, এদিকে এসে শোন—

লম্বা-চওড়া পালোয়ান গোছেব একজন ছুটে এল । মুখের বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, কি হল ? চেষ্টামেছি করেন কেন দাঁ মণাই ?

কোন আমার সাতপুরুষের ভাগ্নেরা এসে ছেঁ। মেরে গাড়িতে তুলে নিয়ে ভাগতে চায় । দেখ্ দিকি—

নফর কটমট চোখে এদের দিকে চেয়ে বলে, চেহারা তো বেশ ভদ্রলোকের মতো । জুড়িটিও ভাল ঘরের মেয়ে বলে ঠেকে । তোমরা এই কর্মে নেমেছ ?

চন্দ্রিকার চোখে জল আসবার মতো । বলে, কি বলছেন—ছি-ছি ! ইনি কেষ্টমামা নন ? আমাদের এক মামার আসবার কথা ছিল, তাঁকে দেখতে অবিকল এঁরই মতন—

বুড়ো লোকটি এক গাল হেসে বলেন, বুঝতে পেরেছি, ভেগে পড়ো এবার ! চালানি কারবার করি বটে, কিন্তু ট্রাম-ভাড়া

গণ্ডা আষ্টেক ছাড়া বাড়তি সিকি-পয়সাও সঙ্গে রাখি নে।
ভণ্ডিতে কাজ-কারবার—গাঁটে মাত্র এক চিরকুট। একবার
পকেট কেটেছিলে—হেঁ হেঁ মা-লক্ষ্মী, সেই থেকে সামাল হয়ে
গেছি। গাড়িতে নিয়ে তুললে গাড়ি-ভাড়াটাই গচ্চা যেত
তোমাদের।

লোক জমেছে মজার আন্দাজ পেয়ে।

কি বলে ?

জোচ্চার পকেটমার—এ কাজে মেয়েগুলোও নামছে।
মেয়ে-পুরুষ মিশিয়ে দল করেছে। দেখুন তো—চেহারা দেখে
নালুম পাবেন ?

ব্রতীন চন্দ্রিকার হাত ধরে পাশেব দরজা দিয়ে দ্রুত পায়ে
বেবিয়ে পড়ল। পিছন থেকে শুনতে পাচ্ছে—

এই বাঃ—ছেড়ে দিলেন ? পুলিশে না দেন, পিটিয়ে হাতের
স্বখ কবে নিলেন না কেন ?

সর্ব রক্ষা, ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে ছিল। চন্দ্রিকা আর পারে
না—সিটের উপর এলিয়ে পড়ল।

পরিচিত গলির মোড়ে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। তার
পরে ঝগড়া।

চন্দ্রিকা বলে, নানা চিনতে পারলে না ? ভুল করে কি
স্বায়াটাই হল, বলো দিকি।

ব্রতীনও গবম হয়ে বলে, চিনবাব কথা আমার, না তোমার ?
তুমি ছুটে আসছ প্রণাম করতে—তাই তো ধবে নিলাম, কেঁষ্টমামা
ইনিই ।

চন্দ্রিকা বলে, তোমারই আপন মামা—আমাকে তাই চিনে
দিতে হবে ! বউ-ভাতের দিন এক নজর দেখেছিলাম—অত-
গুলো মামাশ্বশুরের মধ্যে ঠিক বাখা যায় নাকি ?

ব্রতীন বলে, শুণ্ড কেঁষ্ট নয়, তিনি হলেন নীল কেঁষ্ট ।
সত্যিকার মামাও নয়, বড় মামার শালা । আমি ভাবলাম
তোমাবই কোন মামা হবেন বুঝি ! কুশাণ্ডিকাব পব অনেক মাং
পায়েই তো মাথা ঠুকতে হয়েছিল—তাব মধ্যে মনে হচ্ছে কেঁষ্ট
ছিলেন একজন ।

ভুল কবছ—কেঁষ্ট নয়, বাম । বাম মামা—যিনি ভাঁজাব
আগলাচ্ছিলেন । মা'কে দিদি দিদি—কবেন, আমবা তাই মামা
বলে ডাকি ।

তখন ব্রতীন বলে, ভুলই হয়েছে সত্যি । সবনেশে ভুল ।
মামা আমাব কি তোমাব—আগে থাকতে খোলসা কবে নেণ্ড
উচিত ছিল ।

আমাদেব মেয়েমান্নুষেব দোষ যে পদে পদে ! মামাশ্বশুরকে
মনে পড়ে না, কোন্ লজ্জায় বলি সে কথা ?

ঐ লজ্জায় আমিও জিজ্ঞাসা করতে পারি নি । তুমি
ভাববে, এত তুচ্ছ আমার মামা যে নামটাও মনে কবতে
পাবে না !

বাড়ির দরজায়—এখন হাসি পাচ্ছে আগাগোড়া ছুৰ্ভোগের
খা ভেবে। ঐ যে—সেই জামাইবাবুটি।

ত্রতীন গিয়ে পথ আটকাল।

ছুটছেন কোথা মশায়? কাল যে খবর দিয়ে গেলেন—
।, আপনিই তো—

ভদ্রলোক বললেন, এসে গেছেন। তাঁরই গঙ্গাজল আনতে
ছি। এসেছেন দশ নম্বর বাড়িতে। লেখার দোষে এক-টা
রব মতো দেখাচ্ছিল—আপনাদের বিশ নম্বরে ভুগ করে বলে
সছিলাম, মাপ করবেন।

কলসিটা কাঁধে তুলে ভদ্রলোক হনহন কবে চললেন।

স্মরণে রাখা।

বানান করতে ‘বিস্মরণ’—

ইজি-চেয়ারে শুয়ে আরেশে চোখ বুঁজে ছিলাম। তড়াক
কবে খাড়া হয়ে বসি। আতঙ্কে সর্ব শবাব কণ্টকিঃ হয়ে
ওঠে—

পুরাণো এক দৃশ্য। সত্যবান রায় গালে হাত চেপে
চোঁচোত চোঁচোত রাস্তা দিয়ে ছুটেছে।

হল কি হে ?

ওরে দাদা, বাধিনী—

শোন, শোন—

ত্রিসীমানায় আর নয়। চললাম। বাস্তব-বিছানা পরে পাঠিয়ে দিও।

খেয়ালি মানুষ সত্যবান—আমার আবাল্য স্মৃতি। ঐ সময়টা সে কিছুদিন আমার বাড়ি এসে ছিল। সকল কাজে ওস্তাদ। ভাল গান গায়, তবলা বাজায় আরও চমৎকার। পাখি-শিকারে বেরুল সেকলে গাদা-বন্দুকটা নিয়ে। এত পাখি মেরে আনল যে পাড়ানুদ্ব ফিষ্টি করেও শেষ করতে পারে না। সরকারি পুকুরে মাছ ধরতে বসিয়ে দিলাম—মিনিটে মিনিটে গোঁথে তুলছে। সর্বশেষে যা গাঁথল, সেট মাছ নয়—মেয়ে-ইস্কুলের মিস্ট্রেস মঞ্জুলিকা সেন। বাড়ি ফিবে যাচ্ছিলেন, আর সেই সময়টা সত্যবান ছিপে দিয়েছে টান। মাছ উঠল না, বঁড়শি গিয়ে বিঁধল মঞ্জুলিকার শাড়িতে।

মঞ্জুলিকা নিশ্চল নিশ্চুপ ছবির মতো দাঁড়ালেন, সত্যবান সন্তর্পণে বঁড়শি খুলতে লাগল। মঞ্জুলিকা হেসে বললেন, গায়ে বেঁধে নি ভাগ্যিস। খুব বেঁচে গিয়েছি।

তা গায়ে না বিঁধুক, মনে বিঁধেছিল—বাঁচেন নি পুরোপুরি। অনতিবিলম্বে সেটা টের পাওয়া গেল। একদিন হঠাৎ কানে বাজল, ‘ভুমি’ ‘ভুমি’ করে কথা বলছে। ‘আপনি’ থেকে ‘ভুমি’তে পতন—এই রেঃ! চমকে তাকালাম ওদের দিকে।

কিন্তু সম্বোধন ইতিমধ্যে এমন রপ্ত হয়ে গেছে যে বাইরের লোকের এতে বিশ্বাসের হেতু থাকতে পারে, সে বোধশক্তি পর্যন্ত নেই। শ্রীসত্যবানও এত দিনে নারী-কবলিত হলেন—সবাই আমরা অত্যন্ত খুশি।

বেশ চলেছে। ইঠাৎ এক টেলিগ্রাম—সত্যবানের বাপের বাড়াবাড়ি অসুখ। চলে যেতে হচ্ছে—ক'দিনের জন্য তা-ও ঠিক করে বলা যায় না। বিকালের গাড়িতে যাবে, এই পর্যন্ত ঠিক আছে। মঞ্জুলিকার ইস্কুল আবার সাড়ে-দশটা থেকে সাড়ে চারটা অবধি। অতএব সত্যবান সকাল-বেলা সজল চোখে বিদায় নিতে গেল।

এমনি অবস্থায় কথাবার্তার কখনও শেষ হয় না। ন'টা বাজলে অগত্যা মঞ্জুলিকাকে উঠে পড়তে হল। বাকি কথা চিঠিতে হবে। ঘাড় নেড়ে মঞ্জু বলেন, তুমি যা লিখবে—সে জানি। কলকাতার ঠিকানাটা দিয়ে যাও। আমি আগে লিখব।

সত্যবান বলে, দেখা যাবে কে লেখে আগে। রাত্রে পৌঁছব, গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে কাগজ-কলম নিয়ে বসব।

টুকরা কাগজে ঠিকানা লিখল—২২ এক, নিম্ন মিল্লি লেন। বাছল্য হলেও তার উপরে নামটা লিখল। এ পর্যন্ত বেশ। কবির চাগিয়ে উঠল সহসা—উপেঁটা পিঠে কোণাকুণি লিখতে গেল, 'স্মরণে রেখো'। ফলা-বানানগুলো সত্যবানের ভেতন আসে না। তা ছাড়া সেই গদ-গদ অবস্থার মধ্যে ম-ফলা

ব-ফলা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর কখন ? এসব পরবর্তী কালে সত্যবান আমায় বলেছে। বলল, ভাববার অবস্থা থাকলে দাদা, ‘স্মরণে রেখো’ না লিখে ‘মনে রেখো’ বা যুক্তাক্ষর বজ্রিত অমনি একটা-কিছু তো লিখতে পারতাম—

কাগজটুকু যেই মঞ্জুর হাতে দিয়েছে, বিষম এক চড় তার গালে।

চড় মেরে একটু পবেই মঞ্জুলিকা সেন ঠাহব করলেন, ইঙ্কুলের অবাচীন ছাত্রী নয়—ছ-ফুট লম্বা চল্লিশ ইঞ্চি ছাতি এক বিঘত গৌফ-সমন্বিত প্রেমিক পুরুষ। কিন্তু প্রহার বহু পূর্বেই লক্ষ্যস্থানে গিয়ে পড়েছে, গালের উপর পাঁচটা না হোক—ছ-তিনটে আঙ্গুলের দাগ ঘূটে উঠেছে, চোঁচাতে চোঁচাতে রাস্তায় ছুটেছে সত্যবান।

আর ক্ষমা হল না। তীরগতিতে ছুটে বেরুল সে স্টেশনে। আর এমনি কাণ্ড—গাড়িও একটা ছিল সেই সময়। কল্লিকাতার নয়, তার উল্টো দিকে। তারই কামরায় উঠে পড়ে গ্রাম ছেড়ে সত্যবান চলে গেল। মঞ্জুলিকা ভুল শোধরাবার ইহজীবনে আর সময় পেলেন না।

তারপর অনেক দিন কেটেছে। ইঙ্কুলের সেই চাকরি করেন মঞ্জুলিকা আজও। পড়ানোয় খ্যাতি আছে, আমার মেয়েটাকে বাড়িতে পড়ান। ‘বিস্মরণ’ বানান ধরছেন। সভয়ে আমি উৎকর্ণ

হয়ে আছি। না, মেয়েটা তার কাকাবাবু সত্যবানের মতো নয়।
নিভুল বলল অত বড় বানানটা।

বৃকের উপর থেকে পাষণ্ড-ভার নামল। সব দোষের ক্ষমা
আছে, কিন্তু বানান ভুলের ক্ষমা নেই মঞ্জুলিকা সেনের কাছে।

ভক্ত ও ভগবান

ভগবান শশিমুখীকে ঘরছাড়া করলেন। এ বাজারে ঘর
বেহাত হলে নতুন জোটানো অতিশয় দুর্লভ। দোতলা
মাঠকোঠা—তার নিচের তলায় থাকে। উপরের চেয়ে অনেক
ভাল নিচের ঘর। গ্রীষ্মে গরম কম; বর্ষায় ফুটো চালের জল
পড়ে উপর-তলায়, নিচে অবধি পৌঁছয় না। ভাড়াও যৎসামান্য—
পাঁচ টাকা। পাঁচ টাকায় ছাউনিওয়ালা আট বাই ছয় পুরোপুরি
ঘর একখানা, বুঝুন! লড়াইয়ের সময় পলায়নের হিড়িকের
মধ্যে এই জমিদারি বাগিয়ে বসে আছে। আইন খারাপ।
কি করবে বাড়িওয়ালা? তাকে তাকে ছিল বহুকাল, শেষটা
ভগবানের দয়ায় সুরাহা হল।

কোন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ঘরে ঢুকে পড়ে বাস্তব থেকে
কিরণবালা দেবীর হাতের বালা বের করল।

লোকারণ্য। শশিমুখী জপ করছিল, জপে তপে মজে

থাকে অহোরাত্রি। মুখে অবিরাম ভগবৎকথা। তপোভঙ্গে
ক্রুদ্ধ হয়ে চক্ষু-তারকা বিঘূর্ণিত করে সে বলে, কোন্ আহাম্যক
বলেছে, কিরণবালার বালা? নাম লেখা আছে? ভগবান
মাথার উপরে। যারা আমার হেনস্তা করছে, আমার সঙ্গে
শত্রুতা সাধছে, দেখছেন তিনি—তিনিই জেনে বিচার করবেন।

বটে রে! বড় গাছে লা বেঁধেছিস—নিকুচি করেছে তোর
ভগবানের।

অখিল দারোগা গজরাতে গজরাতে তীরের মতো বেরিয়ে
গেলেন।

শশিমুখী জনতার অভিমুখে গদগদ কণ্ঠে বলছে, কে কি
করতে পারে আমার? তিনিই চালিয়ে নিয়ে বেড়ান, স্নেহে
হৃৎস্পর্শে সব সময়ের বন্ধু। সমস্ত তিনি দেখতে পান, কোন-কিছু
লুকোছাপা নেই।

উপর থেকে অখিল দারোগার সোল্লাস চিৎকার এল, ধবেছি
ভগবানকে—

এবং অনতিপরে হাত বেঁধে টানতে টানতে ভগবান রাহুতকে
নিচে নিয়ে এল। বিখ্যাত সিঁদেল চোর, তিন বছরের ফেরারি।

অখিল দারোগা গর্বে ফেটে পড়েন।

ও-বেটী বলেছে ঠিক কথা। দেখছিল সত্যিই উপর থেকে।
দেখুন না ছাতের ফুটো, তাকিয়ে ছিল ঐ ফুটো দিয়ে। কথা
শুনে আমার সন্দেহ হল, পা টিপে টিপে ওদিককার সিঁড়ি
দিয়ে উঠে ঝাঁক করে টুঁটি চেপে ধরলাম। টের পেলে ভগবান

ঠিক নিচে লাফ দিত। জেলখানার পাঁচিল টপকাল যে মানুষ,
এটুকু উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়বে, এ আর কঠিন কি !

ছোট দারোগা হামিদ রশুল শশিমুখীকে দেখিয়ে বললেন,
এটাকেও বাঁধুন। সাকরেন্দ। স্বীকার করেছে, একে চালিয়ে
য়ে বেড়ায় নাকি ভগবান—

অখিল নিম্নকণ্ঠে বলেন, তবু ধরিয়ে দিল তো ! স্পষ্ট বলে
ল, মাথার উপরে রয়েছে। খারাপ ব্যবহার করে কাজ
ই, অ্যাপ্রভার হবে।

শশিমুখী ও ভগবানকে একসঙ্গে নিয়ে চলল। বাড়িওয়ালা
চিয়ে বলে, ভক্তের বাস্তুটাও নিয়ে যান দারোগাবাবু। আমার
াড়িতে জায়গা হবে না।

তারপর টানতে টানতে নিজেই বাস্তুটা বাইরে এনে দরজায়
লা এঁটে দিল।

জমাখরচ

ছোট মেয়ের বিয়ের রাতে রসময়বাবু আকস্মিকভাবে মারা
গেলেন। মস্ত-পড়া এবং কনের পিড়ি ঘোরানো ইত্যাকার
অনুষ্ঠানগুলো হয়ে গিয়েছিল, তাই রক্ষা। হঠাৎ কি হল—
কোন ডাক্তার তার হৃদয় পায় না।

দাহ করে আগুনে হাত-পা সঁকে নিমপাতা চিবিয়ে এবং লোহা ছুঁয়ে পরের দিন ছপ্পুরে ওঁদের বৈঠকখানায় বসেছি, সন্তবিধবা যোগমায়া দেবী এসে ফুঁপিয়ে কুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। সম্পর্কে তিনি আমার দিদি হন। রসময়বাবুর গুণপনার কত কথাই যে বললেন! তার পরে চোখ মুছে বললেন, দেখ তো, পাওনা-খোওনা কাব কাছে কি আছে? সমস্ত জমাখরচ আছে ওঁর। আমার চোখ ভাল নয়, তুমি ভাই পড়ে দেখ একটু ভাল করে।

চোখ ভাল থাকলেও তিনি পড়তে পারতেন না। অক্ষর চেনেন না, সে আমি জানি। কিন্তু কি বিপুল কাণ্ড করে গেছেন রসময়বাবু! খেরো-বাঁধা বড় বড় খাতায় প্রকাণ্ড এক জালমারি ভরতি। প্রথম জীবন থেকে প্রতিটি দিন প্রত্যেকটি পাই-পয়সার হিসাব রেখে গেছেন। কোন্ মনিব আছেন কোথায়—তাঁর কাছে দাখিলের জন্ম কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব তৈরি। পাওনার খোঁজ পেলাম না, কিন্তু রসময়বাবু কি রোগে মরেছেন, সেটা যেন ধরি-ধরি করছি। জমাখরচ থেকে রোগের নিদান-নির্ণয়। ইতস্তত কয়েকটা হিসাব তুলে দিচ্ছি, আপনারাও দেখুন—

২৮শে বৈশাখ—

বড় মেয়ে কুস্তী ছবি আঁকিবে। ঐ বাবদ মাস্টারের জন্ম

বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়।

৪৮

কুস্তীর সাবান গন্ধভেল স্নো ক্রীম পাউডার ও জুতা

একুনে

১৩/৪/১০

১২ই জ্যৈষ্ঠ—

চা এক পাউণ্ড	২২
বিস্কুট এক টিন	২১৮০
মাখন এক বোটা	২৫০
ময়দা ১/২৥	১৫০
ঘৃত ১/১	৪৫০

২৮ আষাঢ়—

চিত্রলেখার মাস্টারেব এক মাসের মাহিনা	২৫২
চিত্রলেখা ও মাস্টার মহাশয়ের সিনেমার টিকিট	২১০
ঐ বাবদ ট্যাক্সি ভাড়া ইত্যাদি	৩১০
(বৃত্তীর নাম চিত্রলেখা হল বুদ্ধি। ৬ নং আঁকে দেহ ক ১৫১)	

৪ঠা শ্রাবণ—

চিত্রলেখার পাকা দেবার খবচ মো,	২০৮০
শুভবিবাহের নিমন্ত্রণপত্র ছাপা	৭১০

২২শে শ্রাবণ -

শুভবিবাহে মোট ব্যয় (খাত্ত-নিমন্ত্রণ হেতু নিমন্ত্রিতবর্গকে চিনাবাদাম ভাজা দেওয়া হইয়াছিল)	১২৭৪/০
---	--------

২৪শে শ্রাবণ—

মেজ মেয়ে খুস্তি গান শিখিবে। ঐ বাবদ গানের ইস্কুলে ভবতি করিবাব ব্যয়	২৫২
হারমোনিয়াম	৬৫২
(বিবের হাকামা মিটে নে স্টিভেই। অকালপে সময়ক্ষেপে রসমসেব ধাতে সইত না)	

১৫ই ভাদ্র—

গানের মাস্টারদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ এবং জলসা ইত্যাদির
ব্যয়

৫০৭/০

১৬ই ভাদ্র—

গীতলেখাব জন্ত সেতাব খবদ

১০২৮

(খুস্তি হবে গেল গীতলেখা। রসময় বসিক ছিলেন নি.সলোহ)

১৯শে ভাদ্র—

সেতাব-শিক্ষকের জলযোগাদির জন্ত মাং বড বউ

৩৭০

ঐ সিগারেট ইত্যাদির জন্ত গীতলেখাব নিকট জমা রাখা যায়

৫৮

২৩শে ভাদ্র—

স্বরঞ্জনের পিতার কাছে যাওয়ার বাসভাড়া

২/১০

টিকার আইডিন, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি

৮৮/০

কিরিবার ট্যাক্স

৩৮

(বিরেব প্রস্তাব করতে গিয়ে এই দুর্গতি? কি সর্বনাশ!)

২রা কার্তিক—

স্বরজন ও গীতলেখার পরিণয়ে বেজিস্ট্রেশন ফী ও অন্ত্রাগ্র

বাবদ

৩৩২/০

(শেষবক্ষা হয়েছে, তবু ভাল)

৩রা কার্তিক—

খোঁদির প্রাইভেট মাস্টারের জন্ত বিজ্ঞাপন

৪৮

খোঁদির জুতা, সাবান, পাউডার, স্নো ইত্যাদি

সেলট্যাক্স সহ

১৮৭/১০

বই-খাতা

১২৮/০

১৭ই অগ্রহায়ণ—

মাস্টাবেব নভেম্বরের মাহিনা	২৫১
মঞ্জুশ্রী ও মাস্টাবেব সিনেমার টিকিট	২১০
ঐ বাবদ ট্যাক্সিভাড়া ও অন্যান্য	৩৭৮০

১৯শে পৌষ—

মাস্টাবেব ডিসেম্বরের মাহিনা	২৫১
এক পাউণ্ড চা	২১০
বিস্কুট এক টিন	৩৮৮০
মাখন ১ কোটা	৪১
ময়দা ১২১	২১০

জাহ্নসাবি মাসে মাস্টাবেব গিষ্টায় ইত্যাদিৰ দক্ষণ বডবউব কাছে
জমা বাপা যায়

১৫১

১৯শে মাঘ—

মাস্টাবেব জাহ্নসাবিৰ মাহিনা	২৬১
-----------------------------	-----

২ শে ফাল্গুন—

মাস্টাবেব ফেব্রুয়ারিৰ মাহিনা	২৫১
-------------------------------	-----

৩০শে কার্তিক—

মার্চ হইতে আগস্ট পর্যন্ত মাস্টাবেব মাহিনা সমেত সুদ-খবচা

শোণ মাং মাস্টাবেব পিতৃদেব শ্রীনকুলচন্দ্র ধাড়া

২২৭১

(মোট আট মাসের মাইনে নিষে নিল গাল চড মেবে ।—উঃ ।)

৩বা অগ্রহায়ণ—

খোঁদির পাকা-দেখাব খবচ	২৩৮০
ববপণ মাং শ্রীনকুলচন্দ্র ধাড়া	৩০০১১

(জাব মঞ্জুশ্রী নয় - পূবন্ত খোঁদি)

৭ই অগ্রহায়ণ—

বাড়ি-বন্ধকের দলিল সম্পাদনেব খরচ মোট

৩৩৫।।০

২১শে অগ্রহায়ণ—

খৈদির বিবাহের গহনার মূল্য শোধ মাং শ্রীঋষিভবণ

মালাকার

১৭১০৮৮

শ্রীমতী খৈদির বিয়ের তারিখ ২৪শে অগ্রহায়ণ। রসময়বাবু
ঐ রাত্রেই দেহত্যাগ করেন। বিয়ের আনুষঙ্গিক খরচপত্র
জমাখরচে তিনি লিখে যেতে পাবেন নি।

নামিতা রায়

প্রভাস ও নিশি এক সঙ্গে এল। সকলে হৈ-হৈ করে
উঠে।

ক'টা বাজে? দেরি হয়ে গেছে সত্যি। নামিতার সঙ্গে
দেখা হল অনেক কাল পরে—

নামিতা অর্থাৎ—

নিশি য়ূহ হেসে বলে, সে-ই। নামিতা রায়।

প্রভাস বলে, বিয়ের নেমন্ত্রণে কি দেওয়া যায় বল তো ?

বসতে বাচ্ছিল ফরাসে। সহসা মনে পড়ল, ছলজোড়া
পকেটে ঘুরছে বিকেল থেকে। ওটা উপরে পৌছে দিয়ে
আসা উচিত। উপর-ওয়ালা খুশি থাকবে—আড্ডা ভাঙতে

রাত্রি হয়ে গেলেও আজকের দিনটা তার জন্য অপরাধ হবে না ।

আসছি ভাই কাপড়-চোপড় বদলে । চা দিয়ে গেছে তো ?

তখন মজাদার প্রসঙ্গ পাওয়া গেছে । কেউ আর উচ্চবাচ্য
করল না

বিয়ের নেমস্তনের কথা বলল—কার বিয়ে ?

নমিতার ছেলেমেয়েব হবে—

ছেলে মেয়ের বিয়ের বয়স হয়ে গেল ?

অরবিন্দ কর গুণে হিসাব করছে, ষোল কিস্বা বড় জোর
সতেরো ; ষোল বছরে ছেলের বিয়ে ? হতে পারে না ।

তা হলে মেয়ে—

অত ছোট মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে কেন ? নিজে তো বিষম
প্রগতিশীল—

ওবাই তো বেশি কড়া ঘরোয়া ব্যাপারে । নিজে যা
করে বেড়িয়েছে, ছেলেমেয়েরা না করতে পারে ।

কলকাতায় এসেছে তবে নমিতা ?

কলকাতা ছেড়ে কোথা যাবে ?

কুমার বাহাদুর থাকেন তো হীরাগড়ে । কালে-ভদ্রে
কলকাতায় আসেন ।

কুমারের সঙ্গে সে বিয়ে হয় নি তো ! গোখ ট্যারা
বলে নমিতা-ই বাতিল করে দিয়েছিল ।

বলো কি ! কোন্ ভাগ্যবান গোঁখেছে তবে নমিতা'রায়কে ?...
ভুমি জানো সুবোধ ?

বিশেষ করে সুবোধকে জিজ্ঞাসার হেতু আছে। সে-ও
উমেদার ছিল। চকিতে পুরাণো স্মৃতি ভেসে এল সুবোধের মনে...

সকাতরে নমিতার মুখ চেয়ে সে বলেছিল, একটা লিফট
পেয়েছি অফিসে—

অকুণ্ঠিত করে নমিতা প্রশ্ন করে, কত দাঁড়াল ?

এক শ' পাঁচাত্তর—

ওতে ডাল-ভাত হতে পারে। গাড়ি রাখা চলবে না।
গাড়ি চাই যে আমার—

বলে ঐবাভঙ্গি করে নমিতা চলে গিয়েছিল।

সুবোধ বলতে পার, নমিতার কোথায় বিয়ে হয়েছে ?

নিশি কাগজ পড়ছিল। সে-ই জবাব দিল। মৃথ তুলে
বলে, মোড়ে ঐ যে মার্বেল-বাঁধানো নূতন বাড়ি হয়েছে—

বলো কি হে ! ব্যারিস্টার পি. এম. ধরের বাড়ি—

নিশি বলে, নমিতার সঙ্গে কথা বলে প্রভাস গেট দিয়ে
বেরুচ্ছে, সেই সময় আমার সঙ্গে দেখা। পাড়ার মধ্যে বাড়ি
করেছে, পড়শি হল এবার নমিতা।

অরবিন্দ বলে, মেয়েটা ঘড়েল ছিল—জানতাম, ভাল বিয়ে
হবে। তা একেবারে ধরের সঙ্গে !

তাসের প্যাকেট নিয়ে প্রভাস এসে ফরাসেব প্রাস্তে বসল।
তাস ভাঁজতে ভাঁজতে বলে, কি উপহার দিই বলো তো ?

নিশি বলে, যা-তা দেওয়া চলবে না। পি. এম. ধরের
মেয়ে—

কার মেয়ে বললে ?

নিশি সংশোধন করে বলে, আমরা নমিতাকে চিনি। বলা উচিত অবশ্য নমিতার মেয়ে—

প্রভাস বলে, বিয়ে নমিতার—

সবাই হতবাক হয়ে প্রভাসের দিকে তাকাল।

পি. এম. ধরের বাড়ি থাকে। তাঁর মেয়ের গার্জেন-টিউটর। বিয়ে হচ্ছে আগাদের কালাচাঁদের সঙ্গে। কালাচাঁদ আবার ধরের ওখানে চাকরি করে কিনা! কুড়ি টাকা নমিতা ধার চেয়েছে—কি কি কিনবে। এ ছাড়াও ভাবছি, একটা ভাল জিনিষ উপহার দেবো। হাজার হোক, সেই নমিতা তো!

এবং আরও আশ্চর্য ব্যাপার—নমিতা সেই সময় ঢুকল।

টাকাটা এখন চাই প্রভাস। সময় পাই নে তো! একটুখানি ফাঁক পেয়েছি—দোকানে বেরুব।

অপরূপ সুন্দরী ছিল—কিন্তু সে দেড় যুগ আগেকার কথা। মুখে এখন ভাঁজ পড়ে গেছে, শিরা ভেসে উঠেছে, চোখের কোণে কালি। রংটা ফর্সা হওয়ার দরুন উৎকট দেখাচ্ছে, কালো হলো এমনটা হত না বোধ করি। কেন যে বিয়ে করে নি বয়সকালে!

প্রভাস টাকা আনতে উপরে গেল।

কালাচাঁদ ড্রাইভারকে বিয়ে করছ নাকি নমিতা?

মজুমদার ঔর পদবি। কালাচাঁদ মজুমদার বলে।

হীরাগড়ের কুমার নাকানি-চোবানি খেয়ে গেল—

নিশি টিল্লনী কাটে, তার মতন চোখ ট্যারা নয় জে
—

তবে খুঁড়িয়ে হাঁটে—

নমিতা বলে, ঘোরেন গাড়িতে গাড়িতে । হাঁটেন না ।

স্ববোধ এতক্ষণে কথা বলল, ভাল হয়েছে । ড্রাইভারের
জোঁগাড় হল—গাড়ির আধাআধি হয়ে গেল তা হলে ।

প্রভাস টাকা এনে দিতে নমিতা ঘাড় ফিরিয়ে সেকালের
উদ্ধত ভঙ্গিতে চলে গেল । দৃষ্টি তুলে তাকাল না কারও দিকে ।

চাঁদের আলো

আশ্চর্য চিকিৎসা গুরুচরণেব । আর কেউ না হোক, সুনন্দা
জোর গলায় সাক্ষি দেবে । ইন্সুল ফিরতি এক সন্ধ্যায় সে বাড়ি
ফিরছিল । বিষম দাঁতের যন্ত্রণা—মাড়ি ফুলে উঠেছে, দপদপ
করছে কপালের শিরা ।

সামনে ডাক্তারখানা দেখে ঢুকে পড়ল । ওষুধে না পেরে
ওঠে তে। খানিকটা বিষ দেয় যেন ডাক্তার—তাতে নির্ঝাৎ সর্ব
যন্ত্রণার অবসান । কিন্তু ঢুকে সে মুষড়ে গেল—হোমিওপ্যাথি,
বিষ থাকে না এখানে । লোকে বলে, আলমারি শুদ্ধ সাবান
করলেও একটা হেঁচকি উঠবে না ।

যাই হোক, গুরুচরণ আত্মোপাস্ত মনোযোগ দিয়ে শুনে হাঁ

করিয়ে মাড়ি দেখে বউয়ের সঙ্গে যাবতীয় লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে—বিষ নয়, ওষধই দিল। ফল প্রত্যক্ষ—আগুনে যেন জল পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। কিছু আর নেই। কেবল ঐ যে গালে হাত দিয়ে হাঁ করিয়েছিল, ঐখানটায় কি যেন একটু লেপটে রয়েছে—এই রকম মনে হয়।

হোমিওপ্যাথির এ হেন শক্তিতে সুনন্দা অবাক। পরের সন্ধ্যায় ডাক্তারকে সে ধন্যবাদ দিতে এল। এমন ডাক্তার—অথচ কি আশ্চর্য, একটা রোগি নেই। কম্পাউণ্ডার অধর সরকার আলমারি ঠেস দিয়ে টুলের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে। আর গুরুচরণ গলায় আচ্ছা করে কম্বিটার ছড়িয়ে বিড়-বিড় করে বাংলা মেটেরিয়া-মেডিকা পড়ছে।

নমস্কার নিন ডাক্তার বাবু। কি যে উপকার পেয়েছি, ভাষায় বলতে পারি নে।

হাল ছাড়ে নি তা বলে। সুপ্রচুর ভাষা সংযোগে বহুলক্ষণ বলাবলি চলল। লাজুক মানুষ গুরুচরণ—মুখ রাঙা করে ক্রমাগত না-না—করছে। সামান্য একটা ব্যাপারের জন্তু বিত্বাবতী ইঙ্কুলের মিস্ট্রেস এমন করে বলছেন, লজ্জায় সে কোথায় মুখ ঢাকবে ভেবে পায় না।

এই এক দিনেই যে চুকে গেল, তা নয়। কৃতজ্ঞ সুনন্দা প্রায়ই আসেন। এবং শেষটা হোমিওপ্যাথি নিয়ে পড়লেন। বিত্তে অনেক শিখেছেন বটে, কিন্তু এই তাজ্জব জিনিষ—যাতে মানুষ কেটে জোড়া দেওয়া যায়—না শিখলে জীবনই বুঝা।

কম্পাউণ্ডার বখারীতি ঘুমোয়, আর এরা নিবিষ্ট হয়ে হোমিও-
প্যাথি চর্চা করে ।

হোমিওপ্যাথির কঁাকে কঁাকে গুরুচরণের বাড়িঘরেরও খবরা-
খবর নেয় ।

কে আছে আপনার ?

কুঁড়ের রাজা ঐ অধর সরকার—আবার কে ? মাইনে নেয়
না, ঘুমানো ছাড়া কিছু চায় না আর জীবনে—তাই রয়ে গেছে ।
পশার জমলে ওকে তাড়িয়ে ভাল কম্পাউণ্ডার রাখব ।

তার অবস্থা সুদূর-সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না । পাডাটা
যাচ্ছেতাই । শহরতলী জায়গা তো—আটটা না বাজতে চারিদিক,
দেখ, একেবারে নিশুতি । দিনমানেই এ রাস্তায় যে ক’টা লোক
চলাচল করে আঙুলে গণে নেওয়া যায় ।

গুরুচরণ মনে করিয়ে দেয়, ঘড়ি খারাপ আছে বোধহয়
আপনার । আটটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে ।

হোক গে । বাড়ির লোকে জানে, নতুন টুইশানি নিয়েছি
—হেড মিস্ট্রিসের ছেলেকে পড়াচ্ছি । তা পড়াতে পড়াতে একটু
যদি রাত হয়ে যায়—কি করা যাবে ? ছেলেটা এক নম্বরের
গাথা কি না—বোঝে কম ।

গুরুচরণ সকাতরে বলে, খোলা যায়গায় বেশি রাস্তির এমনি
ভাবে বসা ঠিক নয় কিন্তু । সর্দি লেগে যেতে পারে ।

তবু সুনন্দা কানে নেয় না । অবস্থা উত্তরোত্তর আরও
ঘনীভূত হল । একদিন সুনন্দা প্রস্তাব করে, কি এক জায়গায়

বসে বসে ল্যাজ নাড়েন ! চলুন, রেল-রাস্তার দিকে বেড়ানো
যাক—

গুরুচরণ শিউরে ওঠে । ওরে বাপ রে ! গলার কক্ষটার
আরও এঁটে দেয় ।

সুনন্দা বলে, বোশেখের এই গরমে মানুষে আইটাই করছে—
আপনি এক বোঝা জড়িয়ে আছেন কি করে ?

বেঁচে আছি এরই জন্তে । ক-দিন মেঘ মেঘ করছে—
বাতাস ম্যাজমেজে হয়ে আছে । ভয় তো এই সময় ! গরমের
পর ঠাণ্ডা লেগে চট করে নিউমোনিয়া ধরে যায় ।

কোনক্রমে তাকে বের করা গেল না

সুনন্দা বলে, একা একা পড়ে থাক—সত্যি বড় কষ্ট
তোমার ।

একা কিসে ? অধর সরকার আছে, আর মেটেরিয়া-মেডিক
রয়েছে । ভালই কেটে যায় এক রকম ।

হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হয়—পুরুষমানুষের এ সমস্ত
পোষায় ?

গুরুচরণ বলে, ভাতে ভাত । চাল-ডাল তরকাবিপণ্ডোর
একসঙ্গে কুকারে চড়িয়ে দিই । দিয়ে বই নিয়ে বসি । হাতে
আগুনের আঁচটুকুও লাগে না ।

আচ্ছা, আমি রেঁধে দেবো একদিন । কালই বরঞ্চ । কিনে
কেটে রাখবেন, আমি ফর্দ করে দিয়ে যাচ্ছি ।

ভেবে ভেবে একটু ভারী রকমের ফদ করল সুনন্দা।

পরদিন ইঙ্কুল থেকে সকাল সকাল ছুটি নিয়ে বেশ বেলা থাকতেই এসেছে।

কই ?

ফদ'টাই পাওয়া যাচ্ছে না। বোধ হয় কারো ওষুধ মুড়ে দিয়েছে কিংবা অধর ঝেঁটিয়ে কেলেছে।

সুনন্দা বলে, তোমায় দিয়ে হবে না। আচ্ছা, নিজে আমি বাজার করাব ইঙ্কুলের বেয়ারাকে দিয়ে। গোটা পাঁচেক টাকা দিয়ে দিও আত্মকে।

গুরুচরণ শিউরে ওঠে—পঞ্চ মুদ্রার বাজার একদিনে একসঙ্গে ! কিন্তু বলতে ভরসা হয় না। বলবার ফাঁকও নেই। গল্প—গল্প ! সুনন্দার বিয়ের সম্বন্ধ রোজ নাকি ছটো চারটে করে আসছেই। উকিল, জজ, জমিদার-তনয় . কিন্তু ডাক্তার ছাড়া সে বিয়ে করবে না। এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে অহরহ খিটিমিটি—

টং-টং করে কাদের ঘড়িতে দশটা বাজল। খেয়াল করে নি—আরে সর্বনাশ ! হন-হন করে ছুটল। মা আজ আস্ত রাখবে না।

ইঙ্কুলে গিয়ে মনে পড়ে, টাকার্টা কাল নিয়ে আসা হয় নি তো ! কেরানি বাবুর কাছ থেকে ধার নিয়ে সে বাজার করতে পাঠাল।

সমারোহে রাঁধাবাড়ি হল। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া। আজ
সুনন্দা ভোলে নি—খাওয়ার সময় বলল, চার টাকা সাত আনা
বরচ হয়েছে। দিয়ে দাও।

গুরুচরণ জিভ কেটে বলে, ইস—আগে বললে না কেন?
অথর আলমারি বন্ধ করে চলে গেল। আলমারির মধ্যে ক্যাস
বাক্স—

বাকগে, কাল নিয়ে নেব। অমন করছ কেন, লজ্জা
পাবার কি আছে এতে?

পরদিন ভারি দুর্ধোগ। ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তায় জল
জমেছে। আকাশে মেঘ আছে এখনো। কিন্তু পরমাশ্চর্য
ব্যাপার..এ হেন রাত্রে গুরুচরণ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। রেল রাস্তার
বারে সুনন্দার সঙ্গে দেখা হল। গদ-গদ কণ্ঠে সে বলে, পূর্ণিমা
এসে গেল। চাঁদ কত বড় হয়েছে, দেখ—

সুনন্দা বলে, চাঁদ দেখবার দিনই বটে! আজকে তোমার
ঠাণ্ডা লাগে না?

গুরুচরণ স-দুঃখে বলে, কি রকম ভুঁমি হয়ে যাচ্ছে, সুনন্দা।
জ্যোৎস্না মিষ্টি লাগছে না?

অগত্যা কিছুক্ষণ ধরে জ্যোৎস্না-সেবন এবং মুখে আহা-
আহা করতে হয়। কিন্তু মন অস্থির—বড্ড কড়া তাগিদ দিয়েছে
ইস্কুলেরকেরানি বাবু। বলে, ঘবে চলো—

এখন ঐ কোণের মধ্যে গিয়ে বসা? গুরুচরণ শিউরে
উঠল।

বৃষ্টি আসছে। ভিক্ষে টইটম্বুর হতে হবে—খেয়াল আছে ?
তা হোক। ভিজলামই না হয় একদিন।

সুনন্দা অবাক হয়ে তাকায়। স্পষ্টাস্পষ্টি না বলে আর
চলল না।

এর পরে তোমার অধর সরকার আলমারির চাবি নিয়ে
চলে যাবে। টাকাটা চাই আমার—

কিন্তু নিসর্গ-শোভায় গুরুচরণকে এমন পেয়ে বসেছে, কোন
কথা যেন কানে যাচ্ছে না। সুনন্দা উঠে পড়ল।

চললে ?

ঝাঁঝের সঙ্গে সুনন্দা বলে, নয় তো কি নিউমোনিয়া হয়ে
মারা পড়ব ?

কিন্তু রাগ করলেও কাজ ভোলার মানুষ নয়। সোজা সে
ডাক্তারখানায় চলে গেল অধরের তল্লাসে। আলমারি খুলিয়ে
ক্যাসবাক্স সহ তাকে নিয়ে আসবে রেল-রাস্তায়। চার টাকা
সাত আনা শোধ করে নিয়ে তবে বাড়ি ফিরবে।

ডাক্তারখানায় দস্তুরমতো সোরগোল। জন আট্টেক ভদ্র
ব্যক্তি তক্তাপোশ জুড়ে বসেছেন। আজ অধর বিমোক্ষে
বারান্দার মোড়ার উপর বসে। সুনন্দা ব্রত্ পায়ে গিয়ে তার
কাঁধে হাত দিল।

শোন—

হাত ধরে নামিয়ে আনল সাঁকোর দিকে।

কারা ঐ সব ?

ডাক্তার বাবুর বাবা-কাকা-মামারা আছেন। আর
ওঁরা এসেছেন ভিলসোনার চৌধুরি-বাড়ি থেকে—

এই যে বলেছিল, তোমা বিনে ত্রিভুবনে কেউ নেই—
এখন পিল-পিল করে বাবা-কাকার দঙ্গল আসে কোথেকে ?

আবাব বলে, কি হচ্ছে ওখানে ?

দেনাপাওনা সাবস্ত হচ্ছে। ডাক্তার বাবুর বিয়ে যে ভিল-
সোনায়। কুটুম্বদের ঘর ছেড়ে দিয়ে তিনি এখন বাইরে বাইরে
ঘুরছেন।

সুনন্দা স্তব্ধ হয়ে গেল। খালাব মতো চাঁদ মেঘে একে
বারে ঢেকে ফেলেছে। অদূরে ঘরের মধ্যে হেঁবিকেনের স্নান
আলোয় কুটুম্বের দল হিসাবপত্র নিয়ে মহাব্যস্ত। সুনন্দা
একটা টোঁক গিলে বলে ক্যাসবাগ্গটা নিয়ে চল দিকি ডাক্তার
বাবুর কাছে—

বুড়ো আঙুল নেড়ে অধর বলে, বাস্তব নিয়ে গিয়ে কি হবে ?
ভিতব ঢনঢন। কগি আজ এক মাসের মধ্যে এ-মুখো হয় নি
—ঐ যা সেদিন আপনি এসেছিলেন। তা টাকা আপনার মারা
যাবে না দিদিমণি, পেয়ে যাবেন। নগদ পণও দিচ্ছে চৌধুরিবা—
চার-পাঁচ টাকা হয়ে যাবে তাব ভিতব থেকে।

ভগবানের বিপদ

ভগবান মুশকিলে পড়েছেন। সোয়াস্তি নেই—মানুষজন
অতিষ্ঠ করে ভুলেছে টেঁচামেটিতে।

যমকে বললেন, তুমি অকর্মণ্য—

আজ্ঞে, খুঁই চেঁটা করছি। নতুন নতুন বোগ বেক্সছে,
রোগ পাছে আরোগ্য হয়ে যায় সেই ভয়ে দলে দলে
ডাক্তার। মরছেও অটেল। তবু কমে না।

ভগবান উপদেশ দিলেন, বাচ্চা থেকেই নিকেশ করতে
ধাক। বুদ্ধি না পাকতে, কথা না ফুটতে।

শিশু-মডক লেগে গেল। আরো পূজার ঘট। ঢাকের
বাজনায় জন্তু-জ্যানোয়ার গভীর জঙ্গলে পালাল। ধূপ-ধূনায়
আকাশ অন্ধকার। বলছে, ভগবানের দয়া। ছোটদের তিনি
বড় ভালবাসেন, আদর করে তাই পদতলে টেনে নিচ্ছেন।

কি সর্বনাশ। বুঝলাম, যমকে দিয়ে হবে না। বাটাদের
জ্যান্ত রেখে রেখে মারতে হবে।

বরুণকে ইসারা করলেন। বৃষ্টির জলে টইটম্বর। নদীতে
বান ডেকেছে।

কি বলে এবার ?

বলছে, তাদেরই পাপের ফল এই সমস্ত। পাপ-বণ্ডনের
জগৎ আরও জোর পূজোর জোগাড়-করছে।

ভগবান শিউরে উঠলেন।

আচ্ছা সবাই এই বলে? উশ্টো কথা বলছে না কেউ?

আজ্ঞে, বলে দু-পাঁচ জন। শঠ-ফেরেবান্ধ তারা—ভাল
লোক নয়।

ভেবে চিন্তে ভগবান কুবেরকে বললেন, টাকা ঢেলে দাও
ঐ সব বদলোকের সিঁধুকে।

খলখলিয়ে হাসেন। এবাবে ভালো বুদ্ধি হয়েছে—খারাপ
লোকের উন্নতি দেখে ভগবন্তৃষ্টি দূর হবে। পূজার সোরগোল
কমে যাবে।

লাখপতি কোটিপতি হয়ে গেল পৃথিবীর যাবতীয় চোর
ছুয়াচোর কালোবাজারি মানুষ।

কি বলে এখন লোকে?

পূর্বজন্মের স্মৃতি ছিল, এবারে তাই এত ঐশ্বর্য। এদের
পুণ্যের ফল ফলবে আগামী জন্মে। না খেয়ে না পরে তাই
মন্দির বানাচ্ছে।

ওঃ!

কপালের ঘাম মুছে ভগবান সফরে বেরুলেন। ত্রিভুবন
ঘুরে এলেন অলক্ষ্য ভাবে। এসে অনন্ত-শযায় শুয়ে
পড়লেন।

আসবার সময় কিছু কাপাস-তুলো জোগাড় করে এনে

ছিলেন। তুলো কানে দিয়ে পড়ে আছেন। লোকের চিংকারে আর তিনি বিচলিত হন না।

ধর্মঘট

সকালে উঠেই ভোম্বল রাহুত ম্যানেজারের ঘরে গেল।

ফিষ্টি হচ্ছে তো আজকে রবিবারে? কি কি করবেন? মাংস, দই, মাছ...আব বাবড়িও চাই। আমাব চার জন গেস্ট।

বলে চার ছনো আট টাকা অগ্রিম দিয়ে গুণ-গুণ কবে গান ভাঁজতে ভাঁজতে সে বেকল।

লড়াই ফতে। স্ফূর্তিব প্রাণ গড়ের মাঠ। ববিবাবে পুরো দিনটা আজ ছুটি। মাইনে পাবে ছুটির দিনের। প্রথম এই পুরো মাইনেয় ছুটি।

কম লড়তে হয়েছে এর জন্তে? মোটর-ওয়ার্কাস ইউনিয়ন গড়া হল তো পাশাপাশি আব একটা মোটর-মেনস ইউনিয়ন। ছ-দলে চলল লাঠালাঠি। অনেক চেম্চায় অবশেষে বিরোধ মিটল—শহরের সমস্ত ড্রাইভাব একত্র হল এক ইউনিয়নে।

সপ্তাহে একটা দিন অন্তত ছুটি চাই—এই ছিল একটা দাবি। হুজুররা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন—অম্মায় আবদার! রবিবারটা

অফিস-এলাকার বাইরে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করি, এই ছোট্ট একটু সুখেও বাদ সাধতে চায়।

অতএব ধর্মঘট। ছু-সপ্তাহ শহরে প্রাইভেট গাড়ি চলে নি। হুজুরদের ভিতর নিজেরা অনেকে গাড়ি চালাতে জানেন, লাইসেন্সও আছে। কিন্তু সাহস করেন না। কি জানি, কোন গলিঘুঁজিতে ঘাপটি মেরে আছে—টিল মেরে মোটর ভাঙবে। মাথাও ভাঙতে পারে। অবশ্য মাথার চেয়ে মোটরের দাম অনেক বেশি।

কাজেই তাঁরা হেঁটে হেঁটে যথাসাধ্য অফিস করলেন ; যাদেব সঙ্গে একশ' হাত ব্যবধান রেখে যাতায়াতের অভ্যাস, বাসের সিটে পাশে বসে তাদের কৃতকৃতার্থও করলেন দায়ে পড়ে। অবশেষে নরম হলেন। হোকগে তাই—শুনবে না যখন ঘরের মধ্যে শুয়ে বসেই রবিবার কাটানো যাবে।

তারপরে প্রথম রবিবার আজ। ভোম্বল ইউনিয়নের সেক্রেটারি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই অপরূপ আনন্দ-স্বাদে তার মন-প্রাণ ভরে উঠেছে। ব্রজেনবাবুর প্রতি তারা অতিশয় কৃতজ্ঞ। তিনি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, ভাল উকিল, নিরহঙ্কার অমায়িক ভদ্রলোক। ছু-ছু'খানা গাড়ির মালিক হওয়া সত্ত্বেও ড্রাইভারের ছুখ বোঝেন।

ব্রজেনবাবু পরশু বলছিলেন, লড়াই জিতিয়ে দিলাম—খাওয়াতে হবে ভোম্বল। কবে তোমার মেসে যাব, বলে দাও—

তিনি বলতে পারেন একথা। হু-মুখো লড়াই। লড়াইয়ে হয়েছে দলের লোকের সঙ্গে, তাদের ভয় ভাঙাতে হয়েছে। চাকরি যাবে না—তাড়িয়ে দিয়ে নতুন লোক পাবে কোথায়? ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কোন লোক কাজ নিতে যাবে না। বোঝ না, অত টাকার গাড়ি বসিয়ে রেখে বাবুরা কি কলকল্লায় মরচে ধরাবে? মিটমাট হয়ে যাবে, সবুর করো ক'টা দিন—

আবার মোটরের মালিক ব্রজেনবাবুর বন্ধু-বান্ধবরা এসে পড়লেন তাঁর কাছে।

ভূমি ওদের মধ্যে ভিড়লে কেন? বেরিয়ে চলে এসো—তারপর ক'দিন ইউনিয়ন টেঁকে দেখা যাবে।

অনুরোধ-উপরোধ টলাতে পারে নি ব্রজেন বাবুকে। বান্ধবরা তখন রটাতে লাগলেন, ইলেকশানে দাঁড়াবার মতলব। দেখা যাবে, ড্রাইভারের ক'টা ভোট আর আমাদের কতগুলো।

কুংসা শুনে ব্রজেনবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন, উজ্জ্বল !

ম্যানেজারকে টাকা দিয়ে ভোম্বল ব্রজেনবাবু ও আর তিনটি সহকর্মীকে নিঃশ্রুণ কবতে ছুটল। কাজ চুকিয়ে তারপর ইউনিয়নের অফিসে এসে বসেছে। কত লোক আসছে যাচ্ছে—অভিনন্দন জানাচ্ছে। উল্লাসের অ-বি নেই।

ইতিমধ্যে স্নানাদি সেরে ব্রজেনবাবু এসে উপস্থিত।

এ কি ভোম্বল, এখনো এখানে বসে ?

হাত উঁচু করে দেখালেন। হাত-ঘড়িতে পৌনে-বারো।
ভোম্বল অবাক হল। এরই মধ্যে ?

বলে, যাকগে। ম্যানেজার পাকাপোক্ত লোক—সব ঠিক হয়ে
আছে। চলুন তা হলে—

আর যে তিন জন—তারা বলে, ছ-মিনিট বসুন ব্রঞ্জনবাবু।
চান করে নিচ্ছি। ভুমিও একটু বোসো ভোম্বল-ভাই।

সকলে এক সঙ্গে চলল। ঠাই করে এদের বসাতে বসাতে
ভোম্বল সেই কঁাকে চৌবাচ্চা থেকে ছ চার মগ মাথায় ঢেলে
নেবে।

কিন্তু মেসে এসে দেখল, কেমন নিখুম ভাব যেন।

ম্যানেজার।

ঠাকুর বেবিয়া এসে বলল, তিনি নেই—

খাওয়ার পাট এরই মধ্যে চুকে গেছে ? থাক গে। এই
বাবু চার জনের আব আমার জায়গা তাড়াতাড়ি করে দাও।
মাছের মুড়ো দেবে ব্রঞ্জন বাবুকে, ম্যানেজারকে বলা আছে।

ঠাকুর বলে, রান্না হয় নি বাবু—

সে কি ?

আমাদের ধর্মঘট আজকে—

ভোম্বল ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, এঁদের নেমস্তন্ন করে নিয়ে এলাম,
আমার মান-ইজ্জত যায়—বেছে বেছে তোমরা ধর্মঘটের আর
দিন পেলো না ?

আমি কি করব বাবু? আপনারা জিতলেন—আমাদের
ইউনিয়ন বলে, রশ্মুই-বামুনরাই বা রোজ আগুনের তাতে পুড়বে
কেমন? রবিবারে আমাদেরও কাজ বন্ধ।

কুথায় অবসর ত্রেনেবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, উজ্জ্বল!

শহীদ

মোকামা-ঘাটে নামলাম রাত্রি সাড়ে-দশটায়। ওপায়ে
গিয়ে ছোট-গাড়িতে চাপতে হবে। স্টিমার ঘাটেই অপেক্ষা
করে—কিন্তু আজকে কি বিভ্রাট ঘটেছে, এখনো এসে
পৌঁছায় নি।

কুলিদের জিজ্ঞাসা করি, স্টেশনের এক বাবুকে জিজ্ঞাসা
করলাম—স্টিক-কেউ বলতে পারে না। থামের গায়ে ঠেঁশ
দিয়ে হোল্ড-অলটার উপর চেপে বসলাম তখন। জিরিয়ে
নেওয়া থাক, ট্রেনে বড্ড ধকল গেছে।

শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ আকাশে হাসছে। জোয়ারের গঙ্গা
ঝিকমিক করছে অদূরে উচ্ছল জলশ্রোতে। স্নিগ্ধ শীতল
হাওয়ায় চোখ বুজে আসে। এলোমেলো নানা ভাবনা তন্দ্রাচ্ছন্ন
মনের উপর দিয়ে ভেসে ভেসে যায়।

ভাঙা-কাঁসরের মতো গলায় কে বলল, ছুটো পয়সা দেবেন?

চমকে চোখ মেললাম। সাধারণ 'ভিখারি নয়। এক ভদ্রলোক—চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। কিন্তু মানুষের গলায় এমন খ্যানখেনে আওয়াজ বেরোয়, স্বর্ণের না গুনলে বিশ্বাস হত না।

কে আপনি ?

মানুষ ছিলাম এক সময়ে—

কথাবার্তার ধরনে আতঙ্কগ্রস্ত হচ্ছি। কুলির দল অনেক দূরে গুলতানি করছে। লোকজন সমস্ত ও-ধারে। এদিকটা ফাঁকা হয়ে গেছে।

বাড়ি কোথায় আপনার ?

ছিল রংপুরে। এখন কোন খানে নেই। বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি।

কেমন যেন আচ্ছন্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছি—

নামটা বলুন দিকি।

শ্রীপ্রফুল্ল—

প্রফুল্ল চাকি ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, আজ্ঞে না, প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বুঝতে পেরেছি, কার কথা বলছেন। ঘুমুচ্ছিলেন—বলি, স্বপ্ন দেখছেন এখনো ? প্রফুল্ল চাকি হল বিশ বছরের ছেলে, 'ইম্পাতের মতো দেহ, এক-মুখ হাসি—হাসতে হাসতে নিজের মাথায় আব বুকে গুলি করল এই যেখানটায় আপনি বসে বসে ঘুমুচ্ছেন।

জায়গাটা তাকিয়ে দেখে নিলাম ভাল করে ।

ভদ্রলোক বলেন, ছুটো পয়সা দিন স্তর । বড্ড ক্লিখে
পোয়েছে—দাঁড়াতে পারছি নে । এক কাপ চা খেয়ে আসি ।

চা পাবেন ছু-পয়সায় ?

তা হলে চারটেই দিন । একসঙ্গে অত চাইতে ভরসায়
কুলায় না । তা আপনি ভাল লোক—পুরোপুরি এক
কাপেবই দাম দিয়ে দিন ।

সঙ্গে খাবাব ছিল—কতকটা দিলাম কলাপাতায় কবে ।
গোত্রাসে গিলছেন । কত যে ক্ষুধার্ত, খাওয়ার ধরন দেখে
বুঝতে পারছি । খেতে খেতে তর্গাং মুখ তুলে উৎকট হাসি
হাসতে লাগলেন ।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় শুনে আবার হমতো, স্তব, ধবে বসেছেন
আমি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র । দশা অবশ্য আমাদের একই ।

সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করি, কি বলছেন—আচার্য রায় আর
আপনার দশা এক ?

আজ্ঞে হ্যাঁ । ওঁর দাড়ি ছিল, আমারও এই দেখুন । তিনি
ভারতবাসী নন, বিদেশি—পাকিস্তানি ; আমিও তাই । তবে
বলতে পাবেন, ত্রিকালদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তি তিনি—ক-বছর আগে
মরে বেঁচে গেছেন । আমি অন্ধুর বুঝব কেনন করে ?

খাওয়া শেষ করে পুরো এক গ্লাস জল ঢকঢক করে খেয়ে
প্রফুল্ল রায় বললেন, সিগারেট আছে ? থাকে তো একট
দিন—দেশের কাজ করি ।

সিগারেট বেব করে দিলাম ।

সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে দেশেব কাজের কি সম্বন্ধ, বুঝতে
পাবছি না তো ?

বিদেশি জিনিষ পুড়িয়ে ফেলেছি । স্বদেশি আমলে এ সব
কত বারেছি ! ঐ যে প্রফুল্ল চাকিব কথা হচ্ছিল- সহপাঠি আমবা
হু-জনে । ঝুড়ি ঝুড়ি বিলাতি মাল আমি পুড়িয়েছি, সে-ও
পুড়িয়েছে ।

দেশলাই জ্বলে সিগারেট ধবিয়ে দিয়ে পবমাগ্রহে বলি,
বলুন একটু প্রফুল্ল চাকিব কথা । তাঁর সম্বন্ধে বেশি কিছু তো
জানা যায় না ।

ভাবি চালাক । এ ন বলছিলাম একালদশী—এক সতি ২
গাই । মামলায় খালাসও নে পেয়ে যায় অনেক-বিভল
ভার দিয়ে তাই পথ বেগুন সংরক্ষণ করে নিল । নহলে চিন-
কাল হবে সেই বিশ বছনের ছেলেটি হয়ে থাকত কি-
বেচে থাকলে বুড়ো থুথুড়ে আনাবই মতো সদস্য খুইয়ে টানটান
হয়ে প্লাটফর্মে ভিক্ষে করে বেড়াত ।

ছি-ছি, ও সব বলবেন না । ভাবতেও পাবা যায় না এমন
কথা । বাবাব প্রথম শহাদ হলেন ডিনি—

উদ্দেশ্যে নমস্কার কবলাম । প্রফুল্ল বায়ও থামতে পারেন
চুপ করলেন ।

তাবপব মৃত্যু কণ্ঠে কতকটা আশ্রয়ও ভাবই বলাও লাগলেন,
চালাক বলছিলাম এই জন্মেই তো । দু-হাত জোড়া নমস্কার

আদায় করে নিচ্ছে, আর আমি পেটের দায়ে ছোটো পয়সা চাইলে রাস্তার লোকেও দশ কথা শুনিye দেয়। অথচ হু'জনে বন্ধু আমরা—এক মাঠে খেলেছি, একসঙ্গে ভলট্টিয়ারি করেছি—

জল-তাড়নার আওয়াজ পাচ্ছি। সার্চলাইট দেখা গেল। স্টিমার আসছে। আমার কুলিটা ছুটে এসে মালপত্র মাথায় তুলল।

দিন পনের পরে ভোরবেলা স্টিমার থেকে আবাব ঐ মোকামা-ঘাটে নামলাম। স্টেশনের কাছে নিমতলায় জনতা। একটা লোক গলায় দড়ি দিয়ে মবেছে।

পুলিশ এসে দড়ি কেটে লাস নামাল। জিত্ত বেবিye ঝুলে পড়ছে। বীভৎস চেহারা।

সবলে বলাবলি করছে, যাক—বেঁচে গেল। হবে না মাথা খাবাপ? কি কয়টো পেল এই বয়সে।

ভাল করে চেয়ে দেখি। রাত্রিবেলা অন্ধকারে দেখা—চিনে উঠতে পারি নে। পুলিশ এমনি সময় তার শতচ্ছিন্ন জামার পকেট থেকে এক টুকরা কাগজ বেব ববে পড়তে লাগল—

পশ্চিম-বাংলার প্রথম শহীদ আমি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বায় এতদ্বারা জানাইতেছি...

শান্তিনী

মেয়ে-কামরায় উঠে খুনখুনে এক বুড়ি প্রস্থ করলেন, দন্তপুকুরে তোমরা কেউ নামবে বাছা ?

একটি-দুটি নয়—দশ-বারো জন নানা দিক দিয়ে সাড়া দিল। বুড়ি একটা জায়গা নিয়ে বসে পড়েছেন ইতিমধ্যে। সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, আঃ—বাঁচলাম। ভয় হয়েছিল, বুঝি বা একলাই আমাকে নামতে হয়! হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হয়ে যা কাণ্ড চলেছে—মেয়েমানুষের পথে বেরুনো দায়। তা অনেকেই নামছ তো তোমরা—বিস্তর বলভরসা !

কমবয়সি এক মেয়েকে লক্ষ্য করে বললেন, দন্তপুকুর পৌছবে কখন ?

মেয়েটি বলল, কেউ তা বলতে পারবে না দিদিমা। গার্ড-ড্রাইভারেও নয়। বনগাঁ আর বেনাপোলে হয়তো বা আটকে রাখবে পাঁচ ঘণ্টা দশ ঘণ্টা। সবই ওদের মরজি।

তবু ?

এইটুকু বলা যেতে পারে, সন্ধ্যার পরে আর সকালের আগে কোন এক সময় পৌছবে।

বুড়ি সভয়ে বললেন, আরে সর্বনাশ ! তবে আমার উপায়

কি ? জানাপোলের দিকে কেউ যাবে তোমরা বাছা ? তা হলে সাথে-সঙ্গে যেতে পারি। নয় তো পড়ে থাকব স্টেশনে। মশা যা এক-একটা—এক কাচা করে রক্ত টানে। তা সে মশায় থাক আর বাঘেই টেনে নিক, রাত্তিরবেলা পাকা-পোতা ছেড়ে নড়ছি নে। অত সাহস নেই বাছা। উঃ, পাকিস্তান-হিন্দুস্থান হয়ে যা মুশকিল মানুষের !

ভাগ্যক্রমে জানাপোলের যাত্রীও পাওয়া গেল। ছুটি মেয়ে—আর পুরুষ-গাড়িতে আছে তাদের সঙ্গী চার জন জোয়ান-পুরুষ ও এক ইকুলের ছোড়া। অতএব নিশ্চিন্ত হয়ে বুড়ি ভূতের গল্প শুরু করলেন—

জানাপোলে একবার কি কাণ্ড হল, শোন। অমাবস্তার রাত, আঁধার ঘুটঘুট করছে, আমরা গনিব-কালীবাড়ি থেকে ফিরে যাচ্ছি কালীপূজো দেখে। পাকিস্তান-হিন্দুস্তানের হাঙ্গামা ছিল না তখন, ঠাণ্ডেমতো চলাফেরা করি-কথাবার্তায় বেশ শব্দ-সাজ করে আসছি একটা দল। আমি সকলের আগে। হঠাৎ দেখি, পথের মাঝখানে এই উঁচু এক তালগাছ। এ গাছ আগে ছিল না, থাকতে পারে না। ছ-পাশে গরুর গাড়ির চাকার পই পড়েছে—কত কত বোঝাই গাড়ি হাটে যায় এই পথে—সেই ছ-পইয়ের মাঝামাঝি তালগাছ থাকে কি করে ? যাই হোক, আছি দশ-বারো জন—পাশ কাটিয়ে গেলাম। কিন্তু নাছোড়বান্দা—ঝাঁকড়া ডালপালা মেলে আবার এক তেঁতুলগাছ পথ আটকে আছেন। পিছনে আর একটা

দল আসছিল—মহাদেব ঠাকুর তার মধ্যে। মহাদেবের বিষম রাগ হয়ে গেল—সে আবার গুণীন লোক কিনা! বলল, ইয়ার্কি হচ্ছে? সঙ্গে কে যাচ্ছে, ছাঁস নেই? বোস্—। বলে ঠাকুর পায়েব চটি না খুলে পটাপট ঘা দিচ্ছে তেঁতুলগাছের গায়ে। আর—কি হল, বল তো? বললে বিশ্বাস করবে না। দিদি-ভাইরা—অত বড় গাছ পড়পড় করে মাটি থেকে আকাশে উঠে মিস্তিরদের দোলমঞ্চ পেরিয়ে আমবাগান-শাখাঝড়ের উপর দিয়ে

মেয়ে ক'টি বড়িবে একেবারে কাছ ঘেঁসে বসেছে। একটিব দিকে নজর কবে তিনি বলে উঠলেন, ভগবতীর মতো চেহারাখানা—এ কি তোমাদেব কাসন হয়েছে আজকাল? ক্যাডা হাত কেন দিদি? এই শাঁখাছোড়া পনো। আবার নিয়ে নেবো লঙ্কা; কিসেব—আহা, দেখিই না কেমন মানায়।

বোঁচকা খুলে দুপ্পা এক কোটো বের কবলেন। সোনা-বাধানো শাঁখা তার ভিতর। অনেক—দশ-বাবো ছোড়া তো হবেই। চমৎকার শাঁখাগুলো, আর কি মানান করে সোনায়ে মুড়েছে! চোখে পলক পড়ে না মেয়েদের।

এত শাঁখা নিয়ে যাচ্ছেন কোথা?

জানাপোলে আমার রাবণের সংসার দিদি-ভাই। বেলায় ত্রিশ চল্লিশখানা পাতা পড়ে। পাঁচ ছেলে, চাব বউ। নাতি-নাতনিতে তেরোটি। তিন মেয়ে আছে, তাদের ছেলে-মেয়ে

হয়েছে। মেয়ে-বউ-নাতনি—সকলের শাঁখার ফরমাস। কত-
গুলো লাগে, তা হলে হিসেব করে দেখ।

তার পর মুখ বিষয়ে বলে উঠলেন, বাঃ বাঃ—কি সুন্দর
দেখাচ্ছে!

হাতখানা ভূলে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন বৃদ্ধা।

ভূমি এসো তো দিদি। কেমন নিটোল গড়ন তোমার—
আহা, লজ্জা কিসের? নিজের নাতনিরা আছে অবিশ্বাস—তা
বলে তোমরাও ভাই পর নও। সেকেলে মানুষ—অত আপন-পর
বুঝি নে। শব্দ-হাতের শোভা দেখব, সেই জন্তে বলছি।

একে একে অনেককে পরানো হল।

একটা মেয়ে খুলে রেখে দিতে যাচ্ছে, বুড়ি হাঁ-হাঁ করে
উঠলেন।

খুলো না দিদি, কি যে মানিয়েছে! গয়না তো কত জনে
পরে থাকে, কিন্তু দেখে মুখ পাওয়া যায় না। মনে হয়,
শাওড়ার ডালে মুক্তা ঝুলিয়েছে। তা পরিয়ে একটু তৃপ্তি
পাচ্ছি, মনে শান্তি হচ্ছে—এতে বাদ সাধবে কেন?

গদখালি ছাড়িয়ে বর্ডার-স্টেশন বেনাপোলে এসে গাড়ি
দাঁড়িয়েছে। গদখালি জায়গাটার ভূতের জন্তু প্রসিদ্ধিও
আছে।...ম্যালেরিয়া প্রথম দেখা দিয়েছিল এ-অঞ্চলে, গ্রামকে
গ্রাম উজাড় হচ্ছে। জামাই এসেছে স্বশুরবাড়ি—ইতিমধ্যে
সে বাড়ির সবাই কোঁত। জামাই দরজা ঝাঁকাচ্ছে, ঝাঁকিয়েই
চলেছে। তারপর ঝামাঝম মল বাজিয়ে বউ এসে ছুয়ার খুলল।

জামাই বিষম চটে গেছে ।

আমি চলে যাব এখনই— ।

এসো, এসো না গো ! অত রাগারাগি করে না । দেখ,
অস্থখ-গায়ে আমি উঠে এসেছি—

গেল কোথা বাড়ির সবাই ?

যাত্রা শুনতে গেছে ও-পাড়ায় । তুমি খবর দিয়ে এসো
নি তো ! জ্বর-জ্বর হয়েছে বলে আমিই কেবল যাই নি ।

নির্জন বাড়ির মধ্যে ঢুকে নতুন জামাই খুশি হয়ে ওঠে ।

তা ভালোই হয়েছে । তোমায় একটু একা-একা পাব,
এই কামনা করছিলাম ভগবানের কাছে ।

ভগবানের নামে বউ কেঁপে ওঠে । সে-ও মরে গেছে কিনা,
মরে পেত্নী হয়েছে । যা-ই হোক বসল গিয়ে জামাই । বলে,
ক্ষিধে পেয়েছে । শরীরের অবস্থা এখন কি রকম—রাগ্না করতে
পারবে ?

বউ বলে, খুব—খুব । একটুখানি জ্বর মতো হয়েছে—তা
ছুমি এসেছ, উপোস করে থাকবে নাকি ?

পেত্নী হলেও বউটা বড্ড ভালবাসে স্বামীকে । রান্নাঘরে
গিয়ে উলুন ধরাল । কিন্তু কাঠকুটো নেই—ইদানীং রাঁধা-
বাড়ার গরজ হয় না তো ! কি করবে, এই রাত্রে কোথায়
এখন কাঠ যোগাড় করে বেড়াবে ? এদিক-ওদিক তাকিয়ে
নিজেরই একখানা পা উলুনে ঢুকিয়ে দিল । দাউদাউ করে
জ্বলছে । চিতের আগুনে একবার পুড়েছিল কিনা, আগুনে

তার কিছু হয় না। পোড়ে না, জ্বালা করে না, কোন রকম যন্ত্রণা নেই।

শোবার ঘরে জামাই একা চুপচাপ বসে। শেষটা ভাবল, বাড়িতে কেউ যখন নেই—লাজলজ্জার কি আছে? যাওয়া যাক রান্নাঘরে, গল্পগুজব করিগে দু-জনে।

পা টিপে টিপে এসে বউকে চমকে দেবে—তুকে পড়ে দেখে এই তাজ্জব!

কাস্টমসে মেয়ে-কর্মচারী রেখেছে—ভুডমুড করে তার। কান্নারায় উঠে পড়ল। কীর্তিবাসের বামায়ণে চেড়ির কথা আছে—সেই বর্ণনা মিলিয়ে মিলিয়ে বোধকরি লোক বেখেছে। না দেখা যায় কোথাও এমন কিস্তুতকিমাকার চেহারা, না বোঝা যায় তাদের মুখের কিচির-মিচির এক বর্ণ।

মেয়েরা গল্পে মজে আছে, একজন তার মধ্য থেকে ইংরেজিতে বলল, আপত্তিকব জিনিষ কিছু নেই। আমাদের গল্প মাটি করবেন না—কাজ সেরে চলে যান দিকি তাড়াতাড়ি।

হেসে ফেলে তারাও রীত-রক্ষার মতো দুটো-একটা প্রশ্ন করে নেমে গেল।

গাড়ি ছাড়ো-ছাড়ো, এমনি সময় জন তিনেক এসে সেই কান্নারায় উঠল। কলকণ্ঠে মেয়েরা আত্মবান করে, রাবেয়া, তুই কোথেকে রে?

রাবেয়াও উল্লসিত হয়ে বলে, দল বেঁধে চলেছিল—দেশে

এসেছিলি বুঝি আম-কাঁঠাল খেতে? আমি, চাচীআম্ম।
আর বাড়ির অনেকে এখানে এসেছিলাম এক সাদির ব্যাপারে।

বর্ষীয়সী সহযাত্রীকে দেখিয়ে বলে, এই যে—ইনি চাচী
আমার। আর এরা হল রেবা। আর তপতী। আমবা এক সঙ্গে
পড়তাম চাচী, পাকিস্তান হবাব পব এবা কলকাতায় পালিয়েছে।

বুদ্ধা একটু সরে গিয়ে চুপচাপ এদের পরিচয়-পর্ব
দেখছিলেন। চাচী সাহেব! হঠাৎ তাঁর দিকে চেয়ে বললেন,
চিনতে পারেন?

বুদ্ধা দৃষ্টি কুঞ্চিত করে বললেন, না তো! চোখে বড় কম
দেখি।

গার্ডি ডেড়ে দিয়েছে ততক্ষণে।

চাচী বললেন, মনে পড়ছে না? এই তো পবন্তু দিনের
কথা। ছাপা-শাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন মেয়ে-বউ-নাতনিদেব জন্ম।

আমি? না না, তোমাব ভুল হচ্ছে—

অতক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল, ভুল কেন হবে? যশোবের
কাছে কুমকুমপুবে বাড়ি আপনার। মস্ত বড় সংসাব-ভয়
হেলে, দুই মেয়ে, পাঁচ বউ। মেয়ে-বউর ফরমায়িসি কাপড়
নিয়ে যাচ্ছিলেন। একসঙ্গে অত শাড়ি দেখলে আটক করে
ফেলবে—আমাদের সকলের কাছে তাই একখানা করে গছালেন।
আজকে বিলকুল ভুলে যাচ্ছেন।

রেবার কাপড়ের দিকে নজর করে চাচী বললেন, এই তো—
এই জিনিষ। ঠিক এই বকম ছাপ।

রেবা বলে, যশোরে তাজুল মিন্টার দোকানে কিনলাম।
সে-ও বলল বটে, টাটকা চালান এসেছে কলকাতা থেকে—

মুখ কালো করে বৃদ্ধা বললেন, তা বউ-মেয়েরা যদি
আমার আফ্লাদের জিনিষ বেচে দেয়—আমি তার কি করতে
পারি? পাকিস্তানে সোনার দর কম—এই দেখ, আবার সোনার
শাঁখা বাঁথিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তাদের জন্য। কিন্তু তবু বলব, ভুল
হচ্ছে তোমার মা—বাড়ি ঝুমঝুমপু ব হবে কেন? জানাপোল,
দস্তপুকুরের কাছে। পাঁচ ছেলে, চাব বউ, তিন মেয়ে।

তারপর মেয়েদের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, বর্ডার পার
হতে চলল—শাঁখাগুলো খোল এবার দিদিরা।

মুখকোঁড় রেবা বলে, দিদিমা, দস্তপুকুরের কোন্ দোকানে
আপনার বউ-মেয়েরা শাঁখা বেচেন, ঠিকানাটা বলে দিন।
সেইখানে গিয়ে কিনব। শাঁখা খুলে দিতে মায়া হচ্ছে, খাসা
মানিয়েছে—

ভুল নম্বর

গজানন তরফদার বিরাট ব্যক্তি—আকার ও ঐশ্বর্য হু-দিক
দিয়েই। গদির উপরে বেজার মুখে বসে আছেন তিনি। এই
মাত্র বিষম কাণ্ড হয়ে গেল—আড়তের বহু পুরানো কর্মচারী

ধনেশ্বরকে মেরে ধরে তাড়িয়ে দিলেন। তাড়িয়ে দেবার পর এখন খারাপ লাগছে। সত্যি সত্যি গায়ে হাত তুলবার ইচ্ছেও ছিল না গজাননের। মুখে তস্বি করছিলেন, পুলিশে দেবেন—ভয় দেখাচ্ছিলেন ব্যাপারটা আত্মা করাবার জন্য।

ক্যাশমেমোর বইগুলো গজাননের নিজের জিন্মায় থাকে, তার একখানা কেউ গাফ করেছে। ধনেশ্বরের ঘাঁতঘোঁত জানা—শুধু তারই পক্ষে এ কাজ সম্ভব। চোরাই ক্যাশমেমোয় বিক্রি করে এ যাবৎ কত হাজার লুটেছে, ঠিক কি?

বহু জেরা ও বিস্তর চেষ্টামেচির পর অবশেষে ক্যাশমেমো বের করে দিল ধনেশ্বর। দরোয়ান রামপূজন সিং অতঃপর ধৈর্য রাখতে পারে না—হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে দমাদম ঘুসি ঝাড়তে লাগল। গজানন কোন দিকে পলক মাত্র না চেয়ে মেমোর পাতা উল্টে অতি-দ্রুত যোগ করে যাচ্ছেন। যোগফল দেখে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললেন—এমন কিছু নয়, এগারো টাকা সাড়ে সাত আনা সর্ব-সাকুল্যে। অত্যায়া যদিচ, তবু গজানন এতক্ষণে নিশ্চিন্তে ঘাড় তুলে তাকালেন। ব্যাপার গুরুতর বরং ওদিকেই—মারের গুঁতোয় ধনেশ্বরের নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, গায়ের এখানে-ওখানে রক্তের চিহ্ন। অর্থাৎ এই অবস্থায় যদি সে ধানায় গিয়ে দাঁড়ায়, গজাননেরই ছাড়িয়ে আসতে এগারো সাড়ে-সাত আনার বিশ গুণ বেরিয়ে যাবে।

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন গজানন।

করিস কি? এ কি করছিস পাঞ্জি উল্লুক গাথা? লোভে

পড়ে করেছেই না হয় কু-কার্য—ওর সঙ্গে আমার কতকালের
সম্পর্ক জানিস রে তুই ?

সহানুভূতি পেয়ে ধনেশ্বর হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল।
সতের বছর চাকরির পর, লোভে নয়—নিতান্ত পেটের দায়ে করে
বসেছে। গজাননেরও এখন হয়েছে—নির্গোলে সে বিদায় হয়ে
গেলে বেঁচে যান। পুলিশের হাজিমা হল না, মার-গুতোনের
উপর দিয়েই ফাঁড়াটা কেটে গেল—ধনেশ্বরও এই স্মৃতিতে
তাড়াতাড়ি সরে পড়ল।

টেলিফোন এল এই সময়।

নিজে আসবার নিশ্চয় কোন অসুবিধা ঘটেছে, তাই কোনে
জানাচ্ছে। অনেকক্ষণ থেকে গজানন প্রত্যাশা করছেন,
দেরি হচ্ছে দেখে উদ্বিগ্নও আছেন মনে মনে। রিসিভার
তুলবার সঙ্গে চারিদিক তাকালেন। আড়তের যে দু-একজন
এদিকে-সেদিকে ছিল, স্ফুস্ফু করে সরে পড়ল। গজাননের
নির্দেশ এইরকম। ব্যবসা-সম্পর্কিত নানা রকমের কথাবার্তা
—বাইরের কাউকে সে সমস্ত শুনতে দিতে নারাজ তিনি।

চাপা গলায় গজানন সাড়া নিচ্ছেন, কালাচাঁদ ?

হো-হো—হাসির আওয়াজ শুদিকে।

কালাচাঁদ নাম দিচ্ছ ? তাই মাথা পেতে নিলাম। তোমার
মতন রূপ ঈশ্বর ক-জনকে দিয়ে থাকেন ? তোমার পাশে
কালাচাঁদ ছাড়া আমি কি ?

পারা-গুঠা কোণ-ভাঙা এক আয়না টাঙানো গদির পাশে।

গজানন আড় চোখে তাকালেন একটু সেদিকে । দশ-বারো দিন কামানো হয় নি, কাঁচা-পাকা গৌফ-দাড়িতে মুখ ঢেকে গেছে । তা সবেও—সর্বের তেলের পাইকার কালাচাঁদ বসাক বলেছে সত্যি কথাই—চেহারা তাঁর ভাল । বয়সকালে আরও ভাল ছিল । কিন্তু সে যা-ই হোক—কাছের কথায় না এসে এ ধবনেন আবোল-তাবোল বকছে কেন ? এই বিকালেই মাল টেনে চুব হয়ে আছে নাকি ?

বলছে, তুমি আসছ-আসছ কবে সমস্ত ছুপুরটা আমাদের সেই বেঞ্চিটায় বসে—

কি আশ্চর্য ! গজানন যাবেন কি—কালাচাঁদেরই তো গদিতে আসবাব কথা । সমস্ত গোলমাল করে ফেলেছে । গদি থেকে টাকা নিয়ে দু-জনে একসঙ্গে মুখুজ্জি বাবুর কাছে যাবেন, তিনিই বর্জাবের যাবতীয় বন্দোবস্ত কবে দেবেন । মাতাল-দাতালের সঙ্গে কাজ-কারবার চালানো বিপজ্জনক । নেশার ঘোবে কোথায় কি কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে—আব এ যাবৎ যা-কিছু কামিয়েছেন, সমস্ত উগবে দিতে হবে সুদ সমেত । তার ওপব দেশময় নিন্দা-অখ্যাতি ।

বলছে ওদিক থেকে—

অফিস পালিয়ে পার্কে এসে বসলাম, তখন ঠিক একটা । ঘড়ি দেখছি । একটু যে ছায়ায় গিয়ে বসব, তা-ও ভরসা পাই নে—বেঞ্চিতে না দেখে বাস্তা থেকেই তুমি হয়তো ফিরে যাবে । এতক্ষণে এই বাড়ি ফিরলাম । মাথা ধরেছে—তা

মাথার অপরাধ কি ? দু-বড়ি এসপিরিন খেয়ে কোন করছি ।

গজানন চমকে উঠলেন । ভুল নম্বর দিয়েছে তবে তো—
টেলিফোন-ছুঁড়িগুলোর যা নিয়ম । বললেন, কাকে কি
বলছেন ? কোন নম্বর চাচ্ছেন বলুন তো ? আমার নাম
হল ত্রী—

থাক, গল্প রচতে হবে না । গলা চেপে চেপে চালাকি
করলে কি হবে—তোমার নাম নন্দা দেবী, বুঝতে আমার
এক মিনিটও লাগে নি । চোখে না দেখেও টের পাচ্ছি—
হাসছ ভুমি মিটিমিটি, নিটোল গালে টোল পড়েছে । সত্যি,
এত চাপা গলা কেন বলো তো ? বুড়ো কর্তা কাছাকাছি
আছেন বুঝি ?

গজানন মুখ ঝিঁচিয়ে উঠেন ।

নন্দা-টন্দা কোন পুরুষে চিনি নে । বলছি যে ভুল হয়েছে
আপনার—

নন্দা নামটা বলেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখেন । কারো
কানে গেল না তো ? এইসব আধুনিক মেয়ের নাম করাটাও
অশ্লীলতারই কাছাকাছি এঁদের আমলের লোকের কাছে ।

ছেড়ে দিলাম তা হলে । ভুল নম্বর—

মুখে বলেও কিস্তি ছাড়তে পারেন না । কেমন মায়া লাগে ।
কি কথা এবারে বলে, লোভ হয় শুনতে । কাঁচা বয়সে একবার
এক বন্ধুর বাসর-ঘরে খাটের তলায় লুকিয়ে ছিলেন । ইঁদুর

পায়ের উপর উঠেছিল—সেই সময়টা নড়েছিলেন একটুখানি। তার পরে সে কি ছুঁতোগ! মাঘ মাসের রাত, বাষা শীত পড়েছে। বন্ধু টের পেয়ে এক কলসি জল তাঁর মাথায় ঢালল হড়হড় করে। এত ভোগান্তির পরেও কিন্তু প্রেমালাপ শোনার নেশা কাটে নি—এই এতটা বয়সে আজকে আবার তার পরিচয় পাওয়া গেল।

নাছোড়বান্দা প্রেমিক ওদিকে বলছে, তা দাও ছেড়ে অসুবিধা আছে যখন। কি আর করবে? কর্তা এসে গেছেন বুঝি? বেশ যা-হোক বের করেছ বুড়োর সামনে—ভুল নম্বর। ভারি বুদ্ধি তোমার। কাল সকালে আমি যাব। সুশীল সুবোধ হয়ে কর্তার সঙ্গে কি রকম শঙ্কর-ভাষ্য আলোচনা করি, দেখতে পাবে। আচ্ছা, বিদায়। বিদায়ে—

বিদায়ের বস্তুটা এমন সশব্দে ব্যক্ত করল যে টেলিফোনের এ ধারে এত ব্যবধানে থেকেও ষাট বছরে গজ্ঞাননের দাড়ি-গোঁফ অবধি কণ্টকিত হয়ে ওঠে। ছি-ছি, কি হয়ে দাড়িয়েছে আত্মকালকার এরা? তাঁদের সময়ে বিয়ে-করা পরিবারের সঙ্গেও সারা দিনমানের মধ্যে ঠারেঠোরে একটা কথা বলবার জো ছিল না—প্রবীণেরা তা হলে গালে হাত দিয়ে বসতেন।

ছি-ছি করছেন বটে গজ্ঞানন, কিন্তু কোঁতুকও লাগে। ইচ্ছে করেই ভুল করে নাকি টেলিফোন-ছুঁড়িরা? এর চূপড়ির কাঁঠাল ওর চূপড়িতে বসিয়ে মজা দেখে?

তা যেন হল, কিন্তু কালাচাঁদ বসাকের গতিক কি?

পঞ্চাশ টিন সর্বের তেল বর্ডার পার করতে হবে। মুখুন্ডে বাবুকে পান খাইয়ে অনেক টিন নিঃশেষে চলে গেছে ইতিপূর্বে। ছ-দিককার খরচাই মুখুন্ডে নিয়ে নেন, পরে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়। এপারে ওপারে যত বিরোধ-বিসম্বাদ থাক, সীমান্ত-পাহারাদাররা কিন্তু ঐক্যবোধ ও প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দিচ্ছেন। বে-আইনি মাল পাচারের যে অলিখিত বিধান আছে, উভয় অঞ্চলে তা হুবহু এক। অতএব গোলমাল হবার কথা নয়।

মোতিলাল-হীরালালের মিলে ফোন করে দেখা যাক—
কালার্টাদ সেখানে থাকতে পাবে।

হ্যালো !

বেশ মানুষ কিন্তু তুমি ! দেখলে, পৌছতে পাবলাম না—
তবু চুপচাপ রয়েছ। তিন-চারবার চেষ্টা করেছি তোমার
ফোনে ধরতে। বলে, নো রিপ্লাই—

গজাননের মুখ শুকিয়ে যায়, কোন অঘটন ঘটল নাকি ?
কালার্টাদ আসছে না দেখে এই ফোন তাঁর আগেই করা
উচিত ছিল। তা নয়—হতভাগা ধনেশ্বরের এগারো টাকা
সাড়ে-সাত আনার ব্যাপারে মত্ত হয়ে ছিলেন। কালার্টাদ
বেচারার দোষ কি—বারংবার চেষ্টা করেছে। টেলিফোন-
ছুঁড়িগুলো ঐরকম দায়িত্ববোধহীন—দায়সারা ‘নো রিপ্লাই’ বলে
দিয়ে ঘুম দেয়, অথবা গল্পগুজবে মজে থাকে।

ওদিক থেকে বলছে, এতক্ষণ পরে ফুরসৎ হল ! কি

কাজে ব্যস্ত ছিলে শুনি ? আমি আর কথা বলব না তোমার সঙ্গে—কক্ষণো না—

কালার্টাদ অমনি করে বলছে—অভিমান করছে গজাননের উপর। হয় তো খুব নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে তাকে। মনের দুঃখে খেয়েছেও বোধ হয় দু-এক ঢোক। এমন ঞ্চাকা-ঞাকা মিঠা বুলি সহজ অবস্থায় বেরোয় না তো !

গজানন অপরাধ মেনে নেন।

সত্যি, গোলমালের মধ্যে ভুল হয়ে গেছে। একটু আগে ধনেশ্বরকে নিয়ে এক কাণ্ড—চুরি করে সে ধরা পড়েছে—

খিল-খিল খিল-খিল...ওদিক থেকে যেন জলতরঙ্গ বাজছে।

খাসা কৈফিয়ৎ বানিয়েছ অলক-দা। ধনেশ্বর কোনটি বলো তো ? হাতির মতো নাহুস-নুহুস, গলায় সোনার চেন, কবিতা লেখে ? বাইরের ভড়ং দেখে আমি ঠিক বুঝেছিলাম, ও লোক চোর-জোচ্চোরই হবে।

সচকিত হয়ে গজানন বলল, কে আপনি ? নাম কি আপনাব ?

গলা শুনে চেন না ? আর কারো ফোন করবার কথা ছিল ? স্ত্রীপীতির সঙ্গে সেদিন সিনেমায় গিয়েছিলে—সে-ই বুঝি ?

কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে গেল সহসা।

যাকগে—সংক্ষেপে সারছি—সারা ছপ্পুর বাবা ছিলেন, তাই বেরুনো হয় নি। এখন চা-পার্টিতে যাচ্ছেন, ফিরতে রাত হবে। ভূমি যদি চাঁদপাল ঘাটে এসো, খানিকটা গঙ্গার ধারে বেড়ানো

যায়। বেড়ানো শুধু নয়—বোঝাপড়াও আছে। সময় হবে—না, কাজে বাস্তব ? সুখীতির আসার কথা-টতা আছে ?

সজোরে ছেড়ে দিল ফোন। ফোন ছাড়বার আওয়াজটুকুও গজ্ঞাননের কানে পৌঁছায়। হতভম্ব হয়ে রইলেন তিনি খানিকক্ষণ। এমন মানানসই পাশাপাশি ভুল নম্বর—যন্ত্রটা বোধ করি ভূতাবিষ্ট হয়েছে—খানিকটা এর কথা খানিকটা ওর কথা শুনিয়ে দিল। জুড়ে-গেঁথে বেশ একখানা প্রেমের গল্প দাঁড় করানো যায়। একালের বেপরোয়া হাসিখুশি ও মান-অভিমানের কয়েকটা ঝলক আচমকা এসে পড়ে শুকনো সেকালে রঙ ধারিয়ে গেল। টেলিফোন-মেয়েদের ডুলের দকন কাজের ভণ্ডুল হোক, যা-ই হোক—মজা জমে ভারি চমৎকার।

বিস্তর কাজকর্ম। অস্তুত বিশ জন বাইরে অপেক্ষা করছে নানারকম দরকারে। ত্রিপল-ঢাকা সর্বের তেলের টিন ওদিকে লরি বোঝাই, হয়ে বর্ডারের কাছে পড়ে বয়েছে। সমস্ত ছেড়েছুড়ে গজ্ঞানন উঠে দাঁড়ালেন।

সরকার মশায় ছুটে এলেন।

কোথা যাচ্ছেন ?

শরীরটা ভাল লাগছে না : ওদের যেতে বলে দাও—কাল শুনব।

নতুন কালের এরা ভাগ্যবান—হিংসা হয় এদের উপর। গজ্ঞাননরা ঠকেছেন। বিয়ের আগে চুলোয় যাক—বিয়ের পরই

বা একসঙ্গে কাটাতে পেরেছেন কতটুকু সময়? গভীর রাতে ঘরে ঘরে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে নিঃশব্দে সলজ্জ পায়ে অন্ন এসে ঘরে ঢুকত। সারাদিন এক সংসারের খাটনি খেটে চোখ ঢুলু-ঢুলু—একটা ছোটো অতি-সাধারণ কথাবার্তার পরই ঘুমিয়ে পড়ত। আবার ভোর না হতেই সকলের আগে উঠে উঠোনে ছড়াবাঁট ও গোবর-মাটি দেওয়া...

গৃহিণীও অবাক হয়ে গেছেন।

এখন যে?

বলো কেন, কাজ করবার জো আছে? ধনেশ্বরের ঐ ব্যাপার। টেলিফোন ধরলাম—ভুল নম্বরের ঠেলায় অস্থির। চলো অন্ন, বেড়িয়ে আসিগে একটু। গঙ্গার ধারে যাই চলো।

গল্পপূর্ণা বাক্যাব দিয়ে উঠলেন, সময়টা ঠাউরেছ ভালো। খোকা জ্বরে হাঁসফাঁস করছে, তার উপর জামাই আসছে। একটা ফর্দ কবে সরকার মশাইকে বাজাবে পাঠাবার কথা ছিল—পাঠিয়েছ?

বড্ড ভুল হয়ে গেছে। পাঠাচ্ছি এক্ষুণি—

গজানন তাত্তাত্তি জামাত-আপায়নেব ফর্দ করতে বসলেন।

আনারস

টলতে টলতে মীরা এসে ঢুকল। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে
আসছে যেন।

আনারস কি হল ?

ধরণী বড় একটা হিসাব নিয়ে পড়েছে। জবাব দিল,
জানি নে—

ক্ষিধের জ্বালায় মরি-মরি করে রান্নাঘরে গিয়ে টুকরো
করলাম, হুন মাখালাম। টুলের উপর রেখে কলতলায় মুখ ধুতে
গেছি—অমনি লোপাট !

বেরালে খেয়েছে হয় তো—

বেরালে আনারস খেতে পারে ?

কেন পারবে না ? কচমচ করে আস্ত আস্ত হাঁড়র চিবিয়ে
খায়—এ তো ক-কুচি আনারস !

কাঁদো-কাঁদো হয়ে মীরা বলে, বাটিটাও নেই। বাটিনুজ
কচমচ করে খেল নাকি ? কাল থেকে নিরশ্বু আছি—যা খাচ্ছি,
বমি হয়ে যায়। আমার মুখের আনারস যে চুরি করেছে, ঈশ্বর
তাকে প্রতিফল দেবেন।

এবার ধরণী মুখ তুলে তাকাল। বলে, হিসেবটা শেষ করে

এখনই খাতা ঘাড়ে অফিসে ছুটতে হবে। এখানে হুলা না করে খোঁজ করোগে বেরালে খেয়েছে, কিম্বা আর কি হয়েছে।

খতমত খেয়ে মীরা পালাল। নির্গোলে হিসাব সমাধা করবার জন্তু ধরণী দরজায় খিল দিল এবার।

বছর ছয়েক আগেকার এক ছবি। পশ্চিমের নানা জায়গা ঘুরে মীরাকে কয়েকটা দিনের জন্তু বাপের বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছে। মীরার মা ভুবনমোহিনীও আছেন সঙ্গে। ট্রেন থেকে নামল রাত সাড়ে-নটায়। তখন বাস ছেড়ে গেছে। পরের বাস ভোরবেলা। এতক্ষণ পড়ে থাকতে হবে স্টেশনে।

মীরাব আজ স্নান হয় নি—অবিগৃহস্থ রুক্ষ চুলের বোঝা। দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তিতে মাধুরী যেন আরও বেড়েছে।

ধরণী বলে, কিছু খাবে না মীরা? হতেই পাবে না।

শাশুড়ির দিকে চেয়ে আবদার করে, বকে দিন তো আচ্ছা করে।

ভুবনমোহিনী হেসে বলেন, কি পাওয়া যায় এখানে?

কি খেতে চায় বলুক। সন্দেশ-রসগোল্লা-পানভুয়া—

মাগো! মুখ বাঁকিয়ে মীরা বলে, মিষ্টি গিলতে যাচ্ছি আমি এখন।

মিষ্টি না চলে, লুচি-সিঙাড়া—

ভেজিটেবল-ঘিয়ে ভাজা। যেন্না করে।

ধরণী শেষ চেষ্টা হিসাবে বলে, একটা হোটেলও আছে দেখে

এলাম। বেশি পরসা দিয়ে আল্লাদা ভাত রাঁধিয়ে আনতে পারি। গরম ভাত, আলু-ভাজা, মাছ-ভাজা, দই বা ছুধ যেটা পছন্দ হয়—

ভুবনমোহিনী বললেন, পথে-বাটে যেখানে সেখানে ভাত খাবার মেয়েই বটে! ফল-টল পাও তো তাই দেখ বরং।

মীরা বলে, আনারস যদি পাওয়া যায়—

ধরণী তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। মীরা তখনই আবাব মানা করে, থাকগে। এতখানি রাস্তার হয়েছে—কোথায় খুঁজে বেড়াবে এখন?

অনাবশ্যক জবাব না দিয়ে ধরণী জুতোয় পা ঢুকিয়ে দিল। মীরা কাছে—অত্যন্ত কাছে এসে বলল, শিগগির ফিরো কিন্তু। ভয় করবে।

খাবমান ধরণী মুহূর্তে স্টেশনের সীমা ছাড়াল। ফলের দোকান অদূরে।

কি চাই মশাই?

আনারস—

এখন আনারস—কি বলেন? আম আছে—উৎকৃষ্ট ন্যাংড়া আম। টাকায় দুটো।

ফলের দোকান আর নেই?

বাজারে আছে। কোথাও পাবেন না মশায়। আম না কেনেন, মর্তমান কলা নিয়ে যান।

এক সাইকেল-রিক্সা ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে সাঁ করে চলে
এল ।

আসেন । আমি নিয়ে যাচ্ছি বাজারে ।

কদ্দূর ?

এই তো—সোজা দক্ষিণে—

চলেছে তো চলেইছে । অমীব কণ্ঠে ধরণী প্রশ্ন করে,
কদ্দূর রে ?

এই যে সামনে—

স্টেশন থেকেই তো এক কথা বলছি। দক্ষিণে যেতে
যেতে বে-অব-বেঙ্গলে গিয়ে না পড়ি ।

বাজার মিলিল অবশেষে । ফল-পটিতে ঢুকল । চারটে
দোকানের মধ্যে তিনটে বন্ধ হয়ে গেছে । এটারও ঝাঁপ
ফেলছে । ধবণী হাঁ-হাঁ কবে পড়ল ।

বোথো । আনাবস আছে তোমাব এখানে ভাই ?

আষাঢ়-শ্রাবণে আসবেন । এক ঝুড়ি দু-ঝুড়ি—যা দরকার
নিয়ে যাবেন ।

আজকে চাই যে একটা—

ছাঁটিলোক দাবা খেলছিল । তাদেব একজন প্রশ্ন করে,
বলবৎ বোগি বুঝি ?

ধরণীর দিকে তাকিয়ে দেখলও বটে তাই । বাড়িতে
মুর্খু বোগি থাকলে এমনি ব্যাকুল অবস্থা হয় মানুষের ।

দয়াপরবশ হয়ে লোকটা বলে, শেখপাড়ায় চলে যান ।

‘ছমির’ শেখের বাগানে দেখেছি একটা অকালের আনারস।
অভাবি লোক—বেচবেও।

খালের ধারে রিক্সাওয়ালা নামিয়ে দিল। বলে, সাঁকো
পার হয়ে হেঁটে চলে যান, হুজুর। সামনে শেখ-পাড়া।

ভূমি ‘সামনে’ বলে যখন দেখাও, ভয় হয়ে যায়।

উই যে ঝুপসি-ঝুপসি গাছপালা। দেখতে পাচ্ছেন না ?

জ্যোৎস্নায় দেখা যাচ্ছিল ঠিকই। হাঁটতে হাঁটতে তবু
পায়ে ব্যথা হয়ে গেল। ডাকাডাকি করতে ছমির শেখ
বেরিয়ে এল।

আনারস আছে শুনলাম।

ছিল তো কর্তা। এই সাঁজের বেলা রাজেন বাবু এসে
নিয়ে গেল। বড্ড পেকে গেছে—রাখবার জো নেই। নইলে
এমন অকালের ফল মাস্তোর একটা টাকায় নিয়ে যায় ?

সন্ধ্যাবেলা নিয়ে গেছে তো ?

রোখ চেপে যায় ধরণীর।

রাজেন বাবুর বাড়িটা কোন দিকে, বল তো শেখ সাহেব।

চৌরাস্তা থেকে ডাইনে বাঁকবেন। টিনের ঘর—দোকান
আছে। এক ডাকে সবাই চিনবে।

রিক্সায় উঠে ধরণী বলল, রাজেন বাবুর বাড়ি—

রাজেন বাবু তো তিন জন—বেঁটে-রাজেন, গেছো-রাজেন,
ভূতো-রাজেন—

চৌরাস্তা থেকে ডাইনে বাঁকে। দোকান আছে ভদ্রলোকের।

বুঝলাম। গেছো-রাজেন বাবু হলেন তিনি।

রিক্সার আওয়াজ পেয়ে হেরিকেন হাতে রাজেন দেখা দিল।

ডাক্তার বাবু এলেন?

আজ্ঞে না। আমি অশ্রু লোক—বিষম দরকারে এসেছি।
একটা আনারস নিয়ে এসেছেন—শেখ-পাড়া থেকে। যদি
এখনো খরচা না হয়ে থাকে, পোলে বড্ড উপকার হয়—

রাজেনের মা-ও এসেছেন। অশীতিপর বৃদ্ধা। তিনি
বলেন, দিয়ে দে রাজেন। দায়ে না পড়লে খোঁজে খোঁজে
এসেছে? এক গাদা ডালিম-বেদানা দিয়ে গেল খোকার মেসো
—আনারস কি হবে? এর বাড়ি বোধ হয় এখন-তখন—

ধরণীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ বাবা, শেষ-খাওয়া
খেতে চাচ্ছে বুঝি?

ধরণী সংক্ষেপে অবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ—খেতে চেয়েছে।

আহা-হা!

সুপক্ক আনারসটা বৃদ্ধা নিজেই বের করে আনলেন।

রাজেন বলে, পাঁচ টাকা লাগবে। আড়াই টাকায় কিনেছি।
যাতায়াত, খোঁজাখুঁজি, তা-ও ধরুন—

কিন্তু ছমির শেখ বলল, এক টাকায় কিনেছেন।

যান তবে সেখানে।

না না, রাগ করবেন না—

পাঁচ টাকার নোট দিয়ে ধরণী রিক্সায় চাপল।

জোরসে হাঁকাও—

স্টেশনে ফিরে পরম পুলকে সে লাফিয়ে নামল । রিক্সাওয়ালা বলে, ভাড়া বিবেচনা করে দেবেন, হুজুর । ধরেন সেই কখন থেকে ঘুরছি—

কত ?

আট টাকা—

বলিস কি রে ! চারটে টাকা নে—

সঙ্গে সঙ্গে কথা ও কণ্ঠস্বর অন্য রকম হয়ে গেল রিক্সাওয়ালার ।

মাইরি নাকি ! আরে শোন ও ভাই, সন্ধ্যা থেকে ঘোরাচ্ছে—লোকটা এখন বলে চার টাকা দেবে ।

হাঁক শুনে চার-পাঁচটা রিক্সাওয়ালা ভিড় করে এল ।

ভিক্ষে দিচ্ছ ?

ধরণীও ভয় পাবার লোক নয় । কিন্তু অনতিদূরে মীররা আছে । বচসা বাধলে কি মনে করবে ? আট টাকা দিয়েই ছুটল সে ওয়েটিং-রুমে ।

ইঞ্জি-চেয়ারে মীরা চোখ বুজে আছে । ডেকে সাড়া পাওয়া গেল না—গায়ে নাড়া দিতে হল । চোখ মেলে মীরা বলল, উঃ, কখন গিয়েছ ! একলা একলা এমন ভয় করছিল !

এত লোকজন স্টেশনে—একলা হলে কি করে ?

ঘুম-ভাড়া অলস দৃষ্টি মেলে স্নিগ্ধ মধুর হাসি হেসে মীরা বলে, তুমি না থাকলে বড্ড একলা লাগে আমার ।

আনারস ভুলে ধরল ধরণী । মীরা বলে, আনারস আনতে

গেলে কেন ? ছাড়ানো কি সোজা ! কোথায় ছুরি-বাঁটি,
কোথায় কি ! আনারস যাচ্ছেতাই লাগে খেতে ।

তুমিই তো বললে—

ভুল শুনেছ । আনারস নয়, আম । খ্যাংড়া আম নতুন
উঠেছে—

বিনা তর্কে ধরণী বলে, তাই হবে । আচ্ছা, নিয়ে আসছি
আম—

এবং সে ছুটে বেরল ।

দরজায় খিল এঁটে হিসাবের খাতা সরিয়ে বেখে ধরণী
দেৱাজ থেকে আনাবসের বাটি বের করল । মীরার পায়ের
শব্দে এঠি বাটি দেৱাজে ঢুকিয়েছিল । কপ-কপ করে কুচিগুলো
মুখে ফেলছে । সিটে বাইবে ছড়াল না—ঐ বাটিতেই রেখে
আনার দেৱাজে রেখে দিল । ফাঁক বুঝে ফেলে দেবে এক সময় ।



রান্নাবরের কাজকর্ম সেরে লহু এ-ঘরে এসে বলল, ঝড়সড়
হয়ে আছ কেন দাছ ? ভয় কংছে ?

বীরেন্দ্রবিজয় গর্জন করে উঠলেন ।

ভয় ? ভয় হচ্ছে মনের বিকার । মন শক্ত করো, ভয় উড়ে
পালাবে । নেলসন কি বলতেন, জান ?

হাসি-হাসি মুখে লতিকা বলে, কি ?

এই আমি যা-সমস্ত বলে থাকি । ভয় ছিল না বলেই তো
নেলসন ওয়াটার্লু জিততে পারলেন ।

আপনিও পারতেন দাঙ্গ, যদি আপনাদের আমলে বাঙালিকে
লড়াইয়ে নেবার রেওয়াজ থাকত ।

বীরেন্দ্র মাথা নেড়ে প্রশংসাটা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করেন ।

লহু আবার বলে, আপনার মতো সাহস ক-জনের ? মা-ও
তাই বললেন । তোর দাঙ্গ এসে গেছেন—আর কি । আমরা
তবে কথকতা শুনে আসিগে ।

বীরেন্দ্রবিজয় বললেন, তুইও গেলি না কেন ? একাই আমি
বাড়ি পাহারা দিতাম ।

লতিকা হেসে বলে, হরিনামে আমার কানে তাল লাগে ।
মা তাই বললেন, মাংসটা তবে রান্না কব্ বসে বসে ।...সত্যি দাঙ্গ,
আলনি না এসে পড়লে মা ওঁদের যাওয়া হত না । বাবা
ফিরবেন—সাড়ে-ন'টার গাড়ি বিদায় কবে দিয়ে তারও প্রায় ঘণ্টা
হুয়েক পরে । এই জঙ্গলপুরীর মধ্যে ততক্ষণ মা আমি আর
ছোট ভাইটা—

বীরেন্দ্র ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, ছোটো ভাঁট-নাটা-কাল-
কাসুন্দে—এই আবার জঙ্গল নাকি ? টেরাই-এর জঙ্গলে ঘুরেছি,
সুন্দরবনে ঘুরে বেড়িয়েছি এক নাগাড় দেড় মাস—

একটু দম নিয়ে আবাব বলেন, একবার চিত্তেবাঘের চোখের মধ্যে আঙুল ঘুলিয়ে সবে পড়েছিলাম। কত আর বয়স তখন—
বাইশ-তেইশ।

লতু য়ুহকঠে বলে, বাব এখানে নেই দাছ। তবু কিন্তু ভয়েব জায়গা।

সাপ ?

খাটে বসে ছিলেন বীবেক্সবিজয়—পা ছোটো তুলে উবু হয়ে বসলেন।

আলোটা বাড়িয়ে দে লতু। আব তোরা ভুল কবিস—
কার্বলিক-এসিড ছড়িয়ে দিস নে কেন চাবদিকে ?

সাপও নয় দাছ, ভূত—

ভূত টুত মিছে কথা।

আমবাও তাই ভাবতাম, এই কোয়ার্টাবে আসবাব আগে
পর্যন্ত। কিন্তু—

দেখেছিস ভূত কখনো ?

দেখেছি। তোমাকেও দেখাতে পাৰি। আজ শনিবাব তো
—আজকেই দেখাব। সাড়ে-ন'টাব দেবিও নেই।

সাড়ে-ন'টায় কি হবে ?

ট্রেন বেবিয়ৈ যাবাব সঙ্গে সঙ্গে বাবাণ্ডায় ভূত এসে দাপাদাপি
কবে। কড়া নাড়ে, হাঁক-ডাক কবে এক এক দিন।

সেই মর্যাস্তিক কাহিনীটা লতিকা বলল—

বছব দুই আগে এখানকার স্টেশন-মাস্টার ছিলেন সদানন্দ-

বাবু। তাঁর বড় ছেলে কলকাতায় চাকরি কবে। শনিবার শনিবারে বাড়ি আসে এই সাড়ে-নটার ট্রেনে। গুমটির কাছে রেল লাইন পার হয়ে কোয়ার্টারে আসতে হয়—লাইন পার হবার সময় ছেলেটা ইঞ্জিনের তলায় কাটা পড়ে। তারপর থেকে এই ব্যাপার। কেউ তাই এ স্টেশনে থাকতে চায় না। বাবাও পালাই-পালাই ক'রছেন।

বলিস কি রে ?

দেখতে পাবেন এক্ষণি দাছ। আমি দেখে ফেলেছিলাম একদিন জানলা দিয়ে। রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে ভূতের সর্বাঙ্গ দিয়ে ; মুণ্ডু হেঁচে গিয়েছে, চোখ দুটো তাব মধ্যে থেকে ঠিকবে বেরুচ্ছে। কিন্তু পায়ে জুতো আছে ঠিকই—মচমচ কবে বারাগুয়ার উপর উঠে আসে। ট্রেন এ থামছে, দেখবেন এখনই—'

ট্রেন এসে চলে গেল। অনতিপরে—লতিকা নিখা বলে নি তো—জুতোর আওয়াজ বাবাগুয়ার।

লতিকা চোখ ইসাবা কবে। ফিসফিসিয়ে বলল, জানলা দিয়ে দেখুন তাকিয়ে। যেমন বললাম, দেখতে পাবেন। গা কাঁপছে দাছ, আমি পালাই—

লতু সত্যি সত্যি পিছনের দরজা খুলে ফেলল।

কড়া নাড়ল ওদিকে বাইবে। ছঃসাহসী বীরেন্দ্রবজ্র তড়াক করে ঝাট থেকে লাফিয়ে উঠলেন। এবং দরজা খুলে ভূতের মুখোমুখি দাঁড়াবার কথা—

তা নয়, চক্ষুর পলকে তিনি নতুর আগে আগেই পিছন-
দরজা দিয়ে ছুটে বেরলেন। ভূত বিষম জোবে দরজা খাঁকাচ্ছে।
লভু তখন খিল খুলল।

ঘরে ঢুকে ভূত বাহবেষ্টনে বাঁধল লভুকে। হেসে হেসে, লভু
তখন বলছে, দাতুকে তাড়াবার তালে ছিলাম। দোব খুলতে তাই
দেবি হল। বুড়োমানুষের ভ্যানব-ভ্যানর কাঁহাতক ভাল লাগে!
মা'ব আসতে এখনো আধ ঘণ্টা—এই সময়টুকু ছ-জনে একা-
একা থাকা যাবে।

এই গাড়িতে আসছি—চিঠিটা তা হলে ঠিক পৌঁচেছে ?

দি রয়্যাল হোটেল

ছোট ছিলাম। দি রয়্যাল হোটেলের সম্পর্কে সম্মের
অন্ত ছিল না। কলকাতার ট্রেন সে সময় রাত দশটা আন্দাজ
পৌঁছত। হোটেল বেশি দূর নয় স্টেশন থেকে। বাস্তার
পাশে কাঁচা-ড্রেনের উপর তক্তা দেওয়া ছিল বাতায়াতের জগ্ন।
সেখানে বাঁশের খোঁটার সঙ্গে হেরিকেন বাঁধা। সে আলোয়
পথ দেখা যেত না—কালিঝুলিতে এমন আচ্ছন্ন হয়ে থাকত
যে, হেরিকেনটাই দেখা যেত অনেক কষ্টে। আলো হল
নিশানা—এইখানে দি রয়্যাল হোটেল, কালো হেরিকেন

দেখে বুঝে নিতে হবে। আরো তিনটে হোটেল আছে, কিন্তু রয়্যাল হোটেলের সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না।

সেবার পূজোর বাড়ি যাবার সময় আটকা পড়ে গিয়েছিলাম আমরা। বাড়ি ওখান থেকে বাইশ মাইল। মোটরবাস সবে চলতে শুরু করেছে ওসব অঞ্চলে, একখানা মাত্র বায় ও ফিরে আসে। বৃষ্টিবাদলা খুব হয়ে গেছে কয়েক দিন ধরে, বাস্তা বিষম খাবাপ। এবং সবে ধন নীলমণি সেই বাসখানা উশ্টে আছে রাস্তার পগারে। এখন ঘোড়ার গাড়ি মাত্র ভবসা। অথবা পায়ে হাঁটা। পায়ে হেঁটে অতদূর যাবাব বয়স তখন নয়। ঘোড়ার গাড়ির চারটে সিট ভিতরে, ছ'টা ছাতে; আর কোচবাক্সে বসে যায় দু-জন। এত নিয়েও চড়ন্দাব শেষ করতে পারছে না। বাত দুপুরে বেবোয়, আব পৌছে দেয় পরদিন দেড় প্রহর বেলায়। মাঝ পথে একবার ঘোড়া বদল করে নেয়।

সবাই সর্বাগ্রে বাড়ি যেতে চায়। ভাড়া বাড়িয়ে বারো আনার জায়গায় বাবো সিকে করেছে। মানুষের তখনও চকুলজ্জার বালাই ছিল; চতুর্গণেব বেশি চাইতে ভরসা পায় নি কোচওয়ানেরা। তবে কুখা শোনাতে ছাড়ত না।

কেন, মোটরে কি বলছে মশাই? দশ দিন খানায় পড়ে জল খাচ্ছে—উঠে এসে পৌছে দিতে বলেন না তাদের।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। যাওয়ার উপায় হয় না।

ঘুরে ঘুরে বেড়াই। দিনের মধ্যে দর্শবার গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি
আন্তাবলের স্নাননে।

হোটেলের মালিক অভিল্য। তার বুঝি মনে লাগে।
কাছে ডেকে নিয়ে বলল, মুখ শুকনো করে আছ কেন খোকা?
জলে পড়ে যাও নি। ষাণ্ড-দাও স্ফূর্তি করে পূজো দেখে
বেড়াও এখানে। দশমী-একাদশীতে মোটে ভিড় থাকবে না,
ভাড়া ফের বারো আনায় নামবে। কোচওয়ান বেটোরাই
খোশামোদ করবে দেখে। তখন মজা করে বাড়ি যেও।

সেই মজা করছে ছাড়া উপায়ও নেই অস্ত-কিছু। দি রয়্যাল
হোটেলের চার্জ প্রতি বেলায় দশ পয়সা। ভরপেট খাওয়া,
মাথার তেল এবং বাতে শোওয়ার মাহুব। আব যাবা তামাক
খায়—যত ছিলিম খুশি সেজে খেতে পারো, শুধু অভিল্যকে
টানতে দেবে এক-একবাব।

মহাফটমীব দিন অভিল্য ঘিয়েব লুচি, বেগুন ভাজা,
কুমড়োর ছকা ও মোহনভোগ খাওয়াল। বলে, এ ও দিচ্ছি ঐ
দশ পয়সায়। অত লাভ লোকসান দেখতে গেলে চলে না।
বছরকার দিন—বাড়ি যেতে পারলে কত কি ভালমন্দ খেতে,
আমি ছাইভস্ম কি-বা খাওয়ালাম! রান্না কেমন হয়েছে?
ছকাটা নিজে পাক করেছি।

সত্যি, কি অপক্লপ রেঁধেছিল ঐ সামান্য অতি-সাধারণ
তরকারিটা! মনে করতে গেলে আজও জিভে জল আসে।

অভিল্য বলে, গোড়ায় সমস্ত আমি একা রান্না করতাম।

হুজুন মাত্র ছিলাম—আমি আর রাজকুমারী। আমি রাঁধি, সে জোগাড় দেয়।...ও রাজকুমারী, হল তোমার পান সাজা? বাবুদের কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে? কাজকর্ম আছে তো সকলকার।

দাওয়ার প্রান্তে মাতৃরের উপর অভিলাষ পা ছড়িয়ে বসে আছে। খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে এসে বসছে ওখানে। পাশে ক'টা বেঞ্চি আছে—সেখানেও বসছে কেউ কেউ।

অভিলাষ গল্প করে, কি দিনই গেছে। ঐ রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে খদ্দের ডাকাডাকি করতাম...মুগের ঝাল, চিংড়ি পুইডাটা চচ্চড়ি, ইলিশ মাছ—এখনো গো, কে বাবে এসো চলে। এখন ডাকতে হয় না, আপনি এসে সকলে পায়ের ধুলো দেন। এক একদিন ভাত ফুবিয়ে যায়, তিনটে বামুনেও জোগান দিয়ে উঠতে পারছে না। সমস্ত বাপ ঠাকুরদার পুণ্য।... কই রাজকুমারী হল তোমার?

রাজকুমারী বেরিয়ে এসে ডাবর ভরতি সাজা পান দিয়ে গেল। পান সাজার কাজটাই শুধু তার। তা ঠিক হাতেই ভার পড়েছে। ফর্শা চেহারা, এক পিঠ চুল, সরম ভরা চলন—এত কাল পরে এইটুকুই মনে আছে সেদিনকার রাজকুমারী সম্পর্কে।

হাত বাজর ডালার উপর ফোকর কাটা—অভিলাষ পয়সা গুণে গুণে তার মধ্যে ফেলে, আর পানের খিলি দেয় দুটো করে। অভিলাষ পান হাতে তুলে দিলে বুঝতে হবে, পাওনা গণ্ডা পেয়ে গেছে। ব্যাপারটা ক্যাশমেমোর সামিল।

দেনা পাওনা মেটানো অবশ্য একেবারে। অভিলাষ কারো বায়ুন খুড়ো, কারো বা বায়ুন দাদা। দেখা হলোই—ভালো আছেন রাহুত মশায়, বাড়ির খবর ভালো? মামলার ব্যাপারে বুঝি? ক'দিন থাকা হবে? উকিল দিবেন কাকে? মগ্নত চাটুজ্জ...এই সেরেছে! কাজ করবে ভালো, কিন্তু হাড় অবধি চুষে ছাড়বে।

বছর ত্রিশ পরে এই সেদিন আবার গিয়ে পড়েছিলাম সেই মহকুমা শহরে। স্টেশনে নেমে আল্লাজ মতো গেলাম হোটেলের জায়গায়। ধাঁধা লাগে। ইলেকট্রিক হয়ে ইদানীং সারা শহর বিকমিক করছে, কিন্তু এদিকটা অন্ধকার। মানুষ জন দেখি না, হেরিকেনও টাঙানো নেই পুরানো দিনের মতো।

একটা রাস্তার লোক ধবে জিজ্ঞাসা কবলাম, রয়্যাল হোটেল এটা ভাই?

বুঝতে পারে না। বলি, অভিলাষ ঠাকুর গো! তাঁকে খুঁজছি।

লোকটা ঘাড় নেড়ে চলে গেল। হ্যাঁ, এই—

নিঃসংশয় হয়ে দাওয়ার উপর উঠে ডাকাডাকি করছি।

ঠাকুর মশায় ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি? ও ঠাকুর মশায়!

একজন অবশেষে দরজা খুলে বেরুল।

অভিলাষ ঠাকুরমশায়কে ডাকছি আমি—

আপাদমস্তক ঠাহর করে দেখি। নাভো—এ সে লোক নয়।

অভিলাষ চক্রবর্তী?

আজ্ঞে, আমিই—

রুদ্রাঘরায় বাড়ি !

আমারই ছিল। এখন কিছু নেই। ভিটের সর্বের চাষ হয়।

হোটেল ছিল আপনার ?

ছিল মানে ? আছে এখনও।

ক্ষুণ্ণ হয়েছে অভিলাষ। আরও জোর দিয়ে বলল, হাড ক'খানা যদিইন আছে, ততদিন হোটেল থাকবে। দি রয়্যাল হোটেল !

আঙুল দিয়ে দেখাল কেড়ার গায়ে গোঁজা টিনের চাকতি একখানা। এককালে কিছু লেখা ছিল, তার চিহ্ন রয়েছে। হোটেলের সাইনবোর্ড এটা।

বলে, দিনকাল খারাপ। খদ্দেরপত্তোব তেমন নেই। তা এক দিক দিয়ে ভালোই। বুড়ো মানুষ...আরামে আছি। সন্ধ্যার পরে লেপ মুড়ি দিই, কেউ ঝামেলা করতে আসে না।

এই লোক যদি অভিলাষ হয়—বলছে যখন, ধরেই নেওয়া যাক। অভিলাষ হেসে উঠল, কান্নার মতো হাসি।

আমি খাবো ঠাকুরমশাই—

বিশ্বয়ে চোখ কপালে তুলে অভিলাষ বলে, খাবেন ? বাঃ বাঃ ! কিন্তু ভোজ্যানিলয়ে গেলেন না যে ?

জবর হোটেল দেখে এসেছি বটে পথে—সেইটাই ! কারো নজর এড়াতে পারে না। গানের পর গান চলেছে

লাউডস্পিকারে। সে গান এতদূর এসেও কানের পর্দায় মুগ্ধর মারছে।

আমি রয়্যাল হোটেলের পুরানো খদ্দের। সে আমলে কত খেয়ে গেছি। ভোজ্যানিলয়ের মত আলো আর গোলমাল আমার সহ্য হবে না।

বুড়ো-খুঁখুড়ে, কণ্ঠার হাড় বের-করা অভিলাষের গায়ে যেন অশ্রুরের বল এল। দোচালা লম্বা ঘরখানায় সারি সারি খোপ করা। অভিলাষ দরজায় দরজায় ঘা দিখে বেড়াচ্ছে—

ওঠো তৈলক, ওঠো ক্ষেস্তির মা—তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো তোমবা সব। উলুনে আঁচ দাও, বাটনা করো। খদ্দের এসেছেন—পুরাণো খদ্দের। আমরা ভাত না দিলে উপোস করে থাকবেন যে!

যেন উৎসব পড়ে গেল প্রায়-পরিত্যক্ত হোটেল-বাড়িতে। সবাই সেই পুরাণো আমলের লোক। কত জাঁক দেখেছি সেকালে ক্ষেস্তির মা'র। পাটার পর পাটা মশলা বেটে যাচ্ছে—শ্রান্তি নেই, নোড়াব ঘটর-ঘটর আওয়াজের সঙ্গে বাজছে তার হাতের চুড়ি-বাউটি। সমস্ত দিন ধরে বাটনা বাটছে, জল নিয়ে আসছে বালতি বালতি। তারই মধ্যে যে খদ্দের যখন যা জিজ্ঞাসা করছে, হেসে হেসে জবাব দিচ্ছে।

অভিলাষের পুরাণো দলবল বেরিয়ে পড়ল বিশীর্ণ এক এক প্রেতমূর্তির মতো। কাজের ক্ষমতা নেই, অশ্রু কোন-

খানে এদের জায়গা হবে না—অভিলাষের এই গিঁজরাপোলে আশ্রয় নিয়ে আছে। টেমি খেলেছে—আলো আর কতটুকু, ধোঁয়াই বেরুচ্ছে গলগল করে। অভিলাষ নিজে রান্নার বসেছে। তেল কল কল করে উঠল কড়াইতে। সারা দিনের ধকলে আমি মাতুরে গড়িয়ে পড়েছি—কোড়নের গন্ধ নাকে আসছে তন্দ্রার মধ্যে...

খেতে বসিয়ে অভিলাষ জিজ্ঞাসা করে, রান্না কেমন হয়েছে ?

কিন্তু সে অভিলাষ আর নেই—না চেহারায়, না কাক্সের নৈগুণ্যে। কি ঘ্যাঁট রেঁধেছে, গলা দিয়ে ঢুকতে চায় না। কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে সে কথা বলতে পারি নে। বলি, চমৎকাব !

আরও বাড়িয়ে বললাম, আমার মায়ের রান্নার যে স্বাদ পেতাম, কতকাল পরে তাই আবার মুখে পড়ল।

অভিলাষ একমুখ হেসে জোর কবে সেই তবকারি আরও ছ-হাতা পাঁতে ঢেলে দেয়। বলে, খান—খান। আপনি হলেন পুরাণে খন্দের। প্রথম হোটেল খুলে যখন নিজে রান্নাতাম, বাবরা বলতেন—অভিলাষের হাত ধোওয়া জলও যেন অমৃত।

কি হয়েছে ? এত বাস্তব অবধি কেরোসিন পোডাচ্ছ কেন ?

ঝড়ার দিনে রাজকুমারী খাবার-ঘরে ঢকল। ত্রিশ বছর

বয়স বেড়েছে রাজকুমারীর, তবু রূপ আছে। এতকণের মধ্যে এই কেবল একটা জীবন্ত মানুষ দেখলাম।

অভিলাষ হেসে বলে, খদ্দের এসেছেন রাজকুমারী। আরো কত হোটেল রয়েছে, কিন্তু পুরাণো খদ্দের বলে খোঁজা-খুঁজি করে এসে পড়েছেন। কচু বেগুনের একখানা ডালনা রাখলাম নারকেলের ছুধ দিয়ে। কি রকম হয়েছে, শোন ওঁর কাছে। তোমার জন্ম বাটিতে আলাদা করে ঢেলে রেখেছি।

রাজকুমারী মুখ বাঁকিয়ে বলে, আমি খেতে পারিনি ওসব ছাইভক্ষ্ম।

অভিলাষ লজ্জা পেয়ে বলে, দিনকাল খারাপ—তোমার জন্ম পোলয়া-কালিয়ার কে জোগান দিচ্ছে বলো? আর আছে ওবেলার একটু মুসুরির ডাল।

তা জানি। তাই ব্যবস্থা করে এসেছি। ছু-খানা কাঁচা চপ সরিয়ে রেখেছিলাম। তেলে একটু ভেজে নিয়ে তাই দিয়ে খাব।

কাপড়ের ভিতর থেকে কলাপাতায় জড়ানো চপ বের করল। বলে, তোমাদের রান্না খেয়ে মানুষ বাঁচে না। বেঁচে থাকা যায় হাড়গিলে হয়ে—যেমন তোমরা এক একটা।

রান্নার নিষেয় অভিলাষ মরমে মরে গেছে। বিশেষ আমার মতো এই বাইরের খদ্দেরের সামনে। মুখ কালো করে সে বলে, আমি বলি রাজকুমারী, খাওয়াটাও ভোজ্যনিলায়ে ব্যবস্থা

করে নাও। কাজ করবে ওখানে, খাবে এখানে এসে—সেটা ঠিক হচ্ছে না।

রাজকুমারী বাচ্ছিল চপ ভাৰ্জবার ব্যাবস্থা করতে। মুখ ফিরিয়ে তপ্ত কণ্ঠে বলল, ম্যানেজার আজকেই বলছিলেন সে কথা। তুমি ছাড়ো না, তাই সম্বন্ধটুকু ছিল। তা বেশ, কাল থেকেই খাব ওখানে।

শুয়ে পড়েছি। ঘর অন্ধকার। অভিলাষ এক সময় এসে কণ্ঠে ডাকছে, বাবু ঘুমোলেন নাকি ?

উঁহ—

ভোরবেলা বাবু চলে যাচ্ছেন। তাই ভাবলাম, পুরাণো খদ্দের—একটু আলাপ-সাদাপ করে আসি।

রাত দুপুরে এখন আলাপ-পরিচয়ে ইচ্ছা বা সামর্থ্য কোনটাই নেই। সময়ে তাই চুপ করে থাকি।

অভিলাষ বলে, কলকাতায় থাকেন বাবু, আপনি আমার একটা কাজকর্ম ঠিক করে দেন। মোট বওয়া ঝাড়ু দেওয়া—যা বলবেন তাই। হোটেল চলবে না—তুলে দেবো আমার হোটেল। একটু যদি ‘হাঁ’ বলেন, সাইনবোর্ড এক্সুনি খুলে নদর্শনায় ফেলে আসি।

কিন্তু ‘হাঁ’ এর জন্ত ভিলাধ’দেরি না করে ছমছম করে মাটি কাঁপিয়ে সে বেরিয়ে গেল—বোধ করি সাইনবোর্ড ফেলে দেবার অভিপ্রায়ে।

কলম ও কোঁদাল

চাঁদা চাইতে এসেছি। আমার নাম ভবতারণ দাস। আর
বোধহয় পরিচয় দিতে হবে না—

ভদ্রলোক গদ-গদ হয়ে উঠলেন।

বিলক্ষণ! আপনার মতো মানুষ—কে না জানে আপনাকে
ত্রিভুবনের মধ্যে? পরম সৌভাগ্য, আমি হেন অভাজনের
কাছে এসেছেন।

কিঞ্চিৎ জেরা করতে লোভ হয়।

কি করি বলুন তো?

আপনি—চিত্তরঞ্জন দাস...মস্ত বড় ব্যারিস্টার আপনি।
বলুন, ঠিক কি না?

বড় ব্যারিস্টার—সব দিক দিয়ে বড়—ছিলেন একজন ঐ
নামে। কিন্তু শুনতে ভুল করেছেন। আমি ভবতারণ দাস—
বই লিখি।

ভদ্রলোক হো-হো, করে হেসে উঠলেন।

ঠিক, গোড়ায় গলদ! কিন্তু নামের গোলমাল হোক, যা-ই
হোক—আপনার বই আগাগোড়া কণ্ঠস্থ। একজামিন করুন,
লাইনকে লাইন বলে যাচ্ছি।

প্রবল কণ্ঠে চোঁচাতে লাগলেন, শুনছ গো, সেই যেতোমরা
ধস্ত-ধস্ত করো যাঁর বই নিয়ে, তিনি পায়ে হেঁটে এসে উপস্থিত।
দেখসে এসে—দেখে চক্ষু সার্থক করো।

ডাকতে ডাকতে অবশেষে তিনি এলেন। আসতে দেরি
হল—কিন্তু সঙ্গত কারণ আছে। প্রচুর জলখাবার সাজিয়ে
নিয়ে এসেছেন।

কত' বললেন, জান কে ইনি? তারুণচন্দ্র দাস। সেই
যে কি বই—আরে, তোমরাই তো বলছিলে, অমন বই আর হয়
না—

তিনি বললেন, স্বর্ণলতা—

দূর! সে লিখেছে রবি ঠাকুর। এঁর বই—কি নামটা
ভালো? এমন মুশকিল হয় তোমাদের নিয়ে—সমস্ত ভুলে
মেরে দাও।

মেয়ে এলো। বেণী-দোলানো আধুনিকা।

জানিস বেবি, বাড়ি ভাড়া নিতে এসেছেন দেশ-বিখ্যাত
মানুষ। লেখেন। সেই যে তোরা খুব নাম করে বেড়াস
ভবসিদ্ধ বড়ালের—

বেবি মুখ বিস্ময়ে তাকিয়ে বলে, উঃ—কি চমৎকার গান
লেখেন আপনি! আচ্ছা, নাম করুন দিকি আপনার সব চেয়ে
ভালো গানের বইটার—

গীতায় ব্রহ্মবাদ—

উঁহ, কটোমটো নাম নয়—বেশ যে মিষ্টি-মিষ্টি শুনতে।

গীতাম্বলি বলে আর-একটা বই আছে—

হ্যাঁ, ও-ই হবে। আপনারা লেখেন—আর এরা কি যাক্কে-
তাই লেখে বলুন দিকি।

কার বই ?

কে দেখতে যায় ? নাম-টাম পড়িনে—ভিতরের মাল পড়ি।
খাওয়াদাওয়ার পর নবেল নিয়ে শুই। না পড়লে ঘুম পায়
না, তাই পড়তে হয়। কিন্তু পড়া যায় না এমন জঘন্ত—

অবহেলায় টেবিল থেকে বইটা ছুঁড়ে দিল বেবি। আমারই
বই—হায় ভগবান ! আমার সব চেয়ে চিত্তচমকদার উপন্যাস—
স্বর্ণকঙ্কণ।

বেবি বলে, কি যে লেখে এরা ! কলম ছেড়ে কোদাল
ঘরে না কেন ?

অতএব কোদালই ধরব, সর্বাঙ্গতঃকরণে এই সাবাস্ত করলাম।
কোদাল ধরো, কলা-কচু আর্জাও, অধিক খাত্ত ফলাও। শুনলে
তো বেবির মুখে—আগে খাওয়াদাওয়া, পরে ঘুম। ভর-পেট
খেয়ে নিয়ে তবে তো নভেল মুখে দিয়ে পড়বে !

সুচারিতা

মহেন্দ্রঘাটে পদ্মা পেরিয়ে এসে পাটনা জংশনের ওয়েটিং-রুমে
পাড়ির অপেক্ষায় ছিলাম। লোকটিকে দেখলাম সেইখানে।

সেও অপেক্ষা করছে। দেখা হল বছর পাঁচেক পরে—হ্যাঁ, পুরোপুরি পাঁচটা বছর কেটে গেছে তারপর।

খপ করে হাত এঁটে ধরলাম, সব পড়তে না পারে। অনেক দিন ধরে খুঁজছি।

লোকটা হকচকিয়ে গেছে।

কে মশাই আপনি ?

চিনতে পারছেন না ? দেখুন তো ভালো করে। সেদিনও চেনেন নি আমায়। কিন্তু এত কাণ্ডের পরে এখনো কি অচেনা থেকে যাব ?

কি বলছেন ? আমি কি কোনদিন মশাই—

আজ্ঞে হ্যাঁ। রদ্দা কবিয়ে দিয়েছিলেন আমার পিঠে। জুয়াচোব মিথ্যেবাদী মাতাল বলে গালি দিয়েছিলেন। রিতা প্যাট-প্যাট করে চেয়ে রইল, আপনি তখন আমার স্বর্গীয় বাপ-পিতামহের ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। মনে পড়ল এবার ? লোক ভুল করেছিলেন। মিথ্যে বলে ঢাকা-ঢাকি করে লাভ নেই।

রিতা অর্থাৎ সুচবিতার সঙ্গে সে সময়টা জমজমাট অবস্থা। ঈশ্বর দুটো জিনিষ দিয়েছেন—ভাল চেহারা এবং অপরিাপ্ত মিথ্যে বলার ক্ষমতা। ঐ দুটোর জোরে ধরাকে সরা জ্ঞান কবে বেড়াই।

রিতা বিজয়গড়ের মেয়ে। বিজয়গড় নিশ্চয় বিশাল কোন

জায়গা—কোথায় যদিচ সঠিক বলতে পারব না। কারণ ভূগোল পড়া নেই। রেনি-পার্কের প্রকাণ্ড এক অট্টালিকায় থাকে, তারও নাম বিজয়গড়। বিবে পাঁচেক জমির উপর বাড়িটা। তবু অহরহ রিতার খুঁতখুঁতানি—খাঁচার মধ্যে থেকে মরে বাচ্ছে সে। কলকাতার উপরে ফুলের বাগান এবং লন-সম্বলিত অট্টালিকা—রিতার কাছে তা-ও খাঁচা বিশেষ। বুঝুন। বিজয়-গড়ের আসল বাড়িটা অতএব অনুমান হয়, একটি তেপাস্থরের মাঠ। আমি গিয়েছিলাম এই হাটে ছুঁচ বেচেতে! নাকের জলে চোখেব জলে ভাসমান হব, এতে আর বিশ্বাসের কি?

বিজয়গড়ের কম্পাউণ্ডের সামনে রোজ সন্ধ্যায় আমার ঝকঝকে মিনার্ভা-গাড়ি দাঁড়ায়। বিতা কলকণ্ঠে সম্ভাষণ জানায়, উজ্জ্বল দু-পাটি দাঁতের হাসি ঝিকমিকিয়ে ওঠে। প্রেম এমন প্রবল যে গেটের ধাবে দাঁড়িয়ে থাকে, আমারই জন্তু, গাড়ি ভালো কবে না থামতেই দরজা খুলে পাশে এসে বসে। আমার ইচ্ছা, একটুখানি নেমে রিতার মা-বাপেব সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে চা-টা খেয়ে যাই, তা ঘটে ওঠে না কোনদিন। প্রিয়-সঙ্গের জন্তু লোলুপ রিতা—অবসরের এক তিল অপব্যয় হতে দেবে না।

চা খাওয়ার ব্যাঘাত ঘটে না অবশ্য। কোনদিন চাঁদপাল ঘাটে কোনদিন বা চৌরঙ্গিতে। মোটরগাড়ি যদি মানুষ হত, হাত জোড় করে রেহাই চাইত আমার হাত থেকে।

আগে টাকা খরচ করতে হয়, সকল ব্যবসার এই রীতি। কিন্তু তিন তিনটে মাস কেটে গেল, সিকি পয়সা উত্তুল হবার

কোন লক্ষণ নেই। বাক্সবর্ষ এমন ভালবাসার পিছনে
কাঁহাতক ছুটোছুটি করা যায়? তা ছাড়া অবস্থাও ইতিমধ্যে
অতিমাত্রায় সঙ্কট হয়েছে। ডাইভারি চাকরিটা খুঁয়েছি।
বাবু কি করে টের পেয়ে গেছেন, তিনি যখন ক্লাবে থাকেন আমি
গাড়ি নিয়ে পালাই।

অতএব বেমালুম ডুব দিয়েছি। রেনি-পার্কের ছায়াও
মাড়াই নে। যা-কিছু গতিগম্য শহরের উত্তর অঞ্চলে।

চাকরির চেষ্ঠায় সারাদিন টহল দিয়ে বাসায় ফিরছি, সচকিত
হয়ে দেখলাম রিতা দেবী। বাপ-মাকে গোপন করে এসেছে,
জানলে তাঁরা কখনো আসতে দিতেন না। এতটা পথ বেচাবাকে
তাই ট্রামে আসতে হল।

তাকাচ্ছে এদিকে ওদিকে। বাসা দেখে অবাক হয়ে
গেছে। যেমন আমি অবাক হয়েছি তাকে দেখে।

এই জায়গায় থাকেন আপনি?

সদস্তে বললাম—ই্যা, এসে উঠেছি এখানে। বাড়িতে
আর যাব না। কক্কনো না। নাই বা চড়লাম গাড়ি, না
খেলাম কালিয়া-কাবাব! কেন, পায়ে হেঁটে চলে না মানুষ? খায়
না ভাত-কুটি?

হয়েছে কি বলো দিকি? সমস্ত বলতে হবে আমায়।

বাবা কি বলেছেন শুনবে? ভাবতে গেলেও কান্না পায়।
আমার মা বেঁচে থাকলে কখনো এমনটা হত না। এর পরে
আত্মসম্মান নিয়ে যাওয়া চলে না আর ওখানে।

ৰিতা তীব্ৰস্বৰ কৰে, ছিঃ—বাপ ছেলেৰ মধো আবাব
আত্মসম্মান। ৰাগ হলে আমাৰ বাবাও কত কি বলে
থাকেন !

হু-হাত জড়িয়ে ধৰে আমাৰ মুখেৰ দিকে চেয়ে বলতে লাগল,
এক ইণ্টা দেখা নেই—তখনই বুঝলাম, ভয়ানক কিছু হয়েছে।
আমি বলছি—বাবা যাঠ বলুন, তাৰ গালিগালাজ মনে বেথো
না। বাডি চলে যাও।

না—

বিতা কষ্ট হয়ে গলে, কি কৰবে তবে ?

থাকব এই বকম। ট্ৰাইশনি জোটে তো কব একটা-দুটো।
না জোটে, বেবিৰে পডব কলকাতা থেকে।

আব আমি ? খবকাঠি বিতা বলে, আমাৰ অবস্থাটা ভেবে
দেখেছ ? পাড়াৰ সবাই জানে আমাদেৰ মেলামেশাৰ কথা।
বাইবেৰ লোকেও দেখেছে। এই তুমি যাচ্ছ না—গাই নিয়ে
দিনেৰ মধো বিণ বাব মা আমায় বকাবকি কবছেন। কিছু
বলেছিস তুই নিশ্চয়, বাগাৰাগি কবেছিস। বাছাৰ মনে
লেগেছে—তাই আসে না।

তাজ্জব লাগল। স্নেহশীলা মহিলাটিকে চোখেৰ দেখা
দেখলাম না—অথচ ইতিমধ্যে আমি বাছা হয়ে গেছি, মেয়েকে
অহবহ বকছেন আমাৰ এই কয়েকটা দিন না যাওয়াৰ জন্য।

বিতা বলে, শ্যামবাজাৰেৰ মোড়ে মন্দাৰ-দা তোমাৰ দেখলেন।
কেঁদে কেঁদে মাৰা যাচ্ছি, আমাৰ দশা জানেন তিনি—তোমাৰ

পিছু-পিছু এসে বাসাটা চিনে গেলেন। ভাগ্যিস দেখতে পেয়ে-
ছিলেন—নয় তো মবে গেলেও তুমি বোধ হয় আর খোঁজ
নিতে না।

সমস্ত হয়ে উঠেছি। কঠে কান্নার আমেজ এখনও। তা
ছাড়া এ গলিতে এমন সুবেশা নাবীর আবির্ভাবে কৌতূহলী
অনেকগুলো চোখ এদিকে সেদিকে ঘুরছে। নর্দামার পা গন্ধে
বিশ্ব নাকে কাপড় দিয়েছে। ভাল ঘবেব মেয়ে, আব তাকে
নবক-ভোগ কবাত চাই নে। বললাম, বাগ কোবো না।
আমাবও মনব অবস্থা বুঝে দেখে বিতা। কালই যাব আমি,
গিয়ে সমস্ত বলব।

নিশ্চয় যেও। আগাগোড়া না শুনে আমি মোখাশু
পাব না।

অত দূব বেনি-পার্ক অবধি নয় কিন্তু। গাড়ি নেই, বুকতেই
পাবছ। মাঝামাঝি কোনখানে—ময়দানে পুকুবধাবেব সেই
সবুজ বেঞ্চিটায়। কেমন?

ভূলে যেও না। তা হলে আমায় আবার আসতে হবে।

বিতা আবদাবেব ভঙ্গিতে বলে চলে গেল। কিন্তু আমাব
কানে লাগল শাসানির মতো।

পালিয়ে পবিত্রাণ নেই, গন্ধে গন্ধে ঠিক এসে ধবেছে।
কলকাতা ছাড়তে হবে। কোথায় যাওয়া যায়? খোঁজখবর নিতে
এবং বোঁচকা-বিড়ে বাঁধতেও ছুটো-একটা দিন তো লাগবে!

একটু সকাল সকাল গিয়ে পড়েছি ময়দানে। বসে বসে

অদৃষ্ট-চিন্তা কবছি। প্রায় বাহুজ্ঞান-বিবহিত অবস্থা। এমন সময় এই লোকটি।

লোকটি এসেই ঘুঘি মারল আমার পিঠে। আমিও ক্লেপে উঠেছিলাম। গোলমালের মধ্যে সহসা রিতা এবং তাব মন্দাব-দা এসে উপস্থিত।

কি হয়েছে ?

লোকটি ওদের সালিশ মেনে টানা এক গল্প বলে গেল। আমি নির্বাক হয়ে বইলাম।

মন্দাব আগুন হয়ে বলে, শুনলে তো ? ধান্না দিচ্ছে—গোড়া থেকেই আমি বলেছিলাম কিনা ?

বিতাকে তাবপব আর দেখি নি। ক্ষীণদৃষ্টি লোকটিকে পাঁচ বছর পবে এই পেলাম পাটনা স্টেশনে।

সেই পুর্বানো প্রসঙ্গ তুলতে লোকটি মবমে মবে গেল।

ছি ছি ! কি কাণ্ড কবেছিলাম সেদিন ! আপনি নিতান্ত ভদ্রলোক বলেই চুপচাপ সয়ে গিয়েছিলেন। অগ্নি কেউ হলে ঐখানে আগাকে শেষ কবে দিত। তাব পবেই আমার সেই খাতকটার দেখা পাই। টাকাও আদায় হয়ে গেছে।

কিন্তু আমার ভদ্রতা পূর্বোপূর্বি জানতে তখনো তাব বাকি ছিল। টেনেহিঁচড়ে প্লাটফর্মের বাইবে নিয়ে চললাম পান্টা পিটুনি দিতে নয়—খাবার খাওয়াতে। খাওয়া অন্তে বিল

দিল সাত টাকা দশ আনার। বিল চুকিয়ে পরমানন্দে
গলাগলি হয়ে ছ-জনে বেরোলাম।

রিতাকে আর দেখি নি, কিন্তু কিছু কিছু খবর রাখি।
সেদিন কাগজে পড়লাম ওদের বিবরণ। পড়েছেন আপনারাও।

হাওড়ার পুল থেকে সেই যে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল—
লোকটা হল মন্দার (পিতৃদত্ত নাম—মাদার)। কিন্তু রিতা সঙ্গে
ছিল; জলে ডুবেও রেহাই পায় নি। টেঁচামেচি করে লোক-
জন ও মোটর-লঞ্চ জুটিয়ে আবার তাকে ডাঙায় তুলল।

আরও প্রকাশ, স্মৃতিরতা বিজয়গড়ের অথর্ব গিল্লির মাইনে-
করা নাস—পাঁচটা থেকে ন'টা পর্যন্ত বাইরে বেরোবার ছুটি।

এবং সেই যে হাসি-মাখা কিকমিকে দাঁত, তাব ছটো পাটিই
বাঁধানো।

সতী সীমন্তিনী

বংশী-দাদার ছুই সংসাব। ভারি তোয়াজে আছেন।
একদিন গিয়ে দেখি, স্নানের পূর্বে তেল মাখানো পর্ব চলেছে।
জলচৌকির উপর মুদিত চোখে দাদা ধ্যানস্থ হয়ে আছেন—
ছোট বউ সর্নের তেলের বাটি এবং বড় বউ গন্ধ-তেলের
শিশি নিয়ে তেল মাখাচ্ছেন। বড় বউ মাখাচ্ছেন মাথায় ও

বুকে, ছোট বউ পায়ে ও পিঠে। খুব দলাই-মলাই চলবে ঘণ্টা খানেক, তার পরে স্নান। সে-ও হবে দুই বউয়ের মিলিত ব্যবস্থায়। বড় বউ গরম জলে গা ধোয়াবেন, গামছায় বগড়াবেন; ছোট বউ ঠাণ্ডা জল ঢালবেন মাথায়, তোয়ালে দিয়ে পরিপাটি করে মুছে টেডি কেটে দেবেন।

দেখে শুনে দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। বংশী-দাদাব সুখ দেখে একটুখানি হিংসেও হয় মনে মনে। জগৎজনে দেখে চক্ষু জুড়াক। হালের ছোকরারা একটা বিয়েব নামে ঝাঁকে ওঠে—নয়ন মেলে দেখে যাক, দুটো বিয়েব আমি়রি আয়েশ। আগে তো স্তবর্ণ যুগ ছিল—যখন অসংখ্য বিয়ে চলত। কল্লনাব চোখে সেকালের বহু প্রিয়া-বেষ্টিত পুরুষপুঙ্গবেব ছবি অবলোবন কবে নিজেব গাল চড়াতে ইচ্ছে কবে—হ'র-হায়, এমন আত্মশ্লক পুরুষ জাতি! নিজেদেব পায়ে কুড়ল মেবেছি বচবিবাহেব বনেদি রীতি বর্জন করে।

একদা গ্রীষ্মে ছপুরে বংশী-দাদাকে দাবাব আসরে ডাকতে গেছি। সাড়া না দিয়ে ঘবে ঢুকে বিষম বেকুব হলাম। ছোট বউ ঘামাচি খুঁটছেন পিঠের দিকে শুয়ে, বড় বউ বাতাস কনছেন এক পাশে ঝিমোতে ঝিমোতে। পায়ে জুতো ছিল না এই বক্ষা—পা টিপে-টিপে অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলাম। এখন বুঝতে পারছি, ছপুরের আড্ডায় কেন পাওয়া যায় না

দাদাকে। যুগল লক্ষ্মীব মধাবতী ভাগ্যবান নারায়ণ—কোন
হুঃখে তিনি দাবায় বসতে যাবেন ?

কিন্তু বাত্রের ব্যাপার আলাদা। ডাকতে হয় না, সকলেব
আগে চলে আসেন। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করি, ছেড়ে দিলেন
বৌদিদিরা ?

বলে এসেছি নাকি ? তা হলে আসতে দিত না ভায়া।
যত্নের ঠেলায় দম বন্ধ হয়ে আসে, পালিয়ে এসে নিশ্বাস
নিয়ন্ত্রে বাচি।

এক বাজি হয়ে যাবাব পল বাল, আপনি উঠুন দাদা—

কেন ?

বৌদিদিরা তা-পিঠাশ বসে আছেন।

কিছু ভেবে না। তালাও নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমিয়ে
নিচ্ছে। আড্ডায় এসে প্রাণ বাচাই একলা আমাব নয়—
ওদেরও।

সেটা নিজের চোখেও একদিন দেখে এলাম বটে ! বিবম
বৃষ্টি সেদিন সন্ধ্যাব পল থেকে। পথে ঘাটে জল জমে গেছে।
বংশী-দাদাব সঙ্গে হেবিকেন থাকে না। কোথায় জলকাদায়
আছাড় খেয়ে মববেন—আলো নিয়ে আমি পৌছে দিতে
গেছি।

দরজা ঝাঁকিয়ে ভেঙে ফেলবাব অবস্থা—বৌদিদিদের সাড়া
নেই। ঝি এসে দরজা খুলে দিল।

দেখলে ভায়া ? আমি নেই, তাই এখন নিভাবনায় ঘুমুচ্ছে।

আমিও ডাকাডাকি কবি নে—চুপচাপ যেখানে হোক শুয়ে পডি।
ডাকলে বন্ধ নেই—সমস্ত বাস্তব ঠায় বসে সেবা চলবে।

বলেন কি ?

আবার গেবো কেমন ! একজনে উঠে বসল তো আব একজনকে
ডাকতে হবে না। আপনা আপনি কেমন টেব পেয়ে যায়—সে-ও
পাশ-মোড়া দিয়ে উঠবে সঙ্গে সঙ্গে।

স্ত্রী-হত্যার দায়ে পড়বেন দাদা। আপনার কড়া হওয়া উচিত।

তা হয়েছি ভায়া। খুব কড়কে দিই এক-একদিন। অমনি
সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে শুয়ে পড়ে। কিন্তু বুঝতে পারি, উসখুস
করেছে। শব্দ সবালে উঠে দেখা যায়, ছ-পাশে ছ-জনে
যথাবাস্তি মড়া আগলে আছেন। ব্যাপার বুঝলে ভায়া ?
পাল্লা চলেছে সত্যি সোমস্বিনী কেউ কারো কাছে হাবনে না।
না মরবে আমর অব্যাহতি নেই।

মাস তেরেক পরে একদিন পাগলের মতো আমার বাড়ি
ওলেন।

সিন্দুক খুলে দেখিয়ে দিয়েছি—সব ফক। ব্যাক থেকে সব
টাকা ভুলে মাটিতে পুতেছি, তাব পরে পাশ-বই চোখের উপর
মেলে ধবলায়। আর বাড়ি-মবগোজের একটা দলিল কবেছি
তোমার নামে—

হয়েছে কি ?

ভাতে যদি টান কয়ে। কিন্তু লিখাস কবে না, হবেক একম

জেবা কৰে। এবটু বিষ-টিষ জোঁগাড কৰে দিতে পাব
ভায়া, পথ সংক্ষেপ কৰে নিই? মবতেই তো হবে ওদেব
ভালবাসাব গুঁতোয।

বংশা-দাদা মাৰা গেলেন। ছুই বডযেব টানাটানিতে নয়,
ডবল-নিউমোনিয়ায। অন্তৰ্জলিতে নামানো হযেছে, তাবস্ববে
নাম শোনানো হছে। কিন্তু বউদিদিদেব দেখা যাচ্ছে না কেন?
আহা, পতিব্রতা নিষ্ঠাবতী—এত বড আঘাত সহ্য কৰতে পাবলে
হয়। কোথায় পড়ে কেঁদে ভাসাচ্ছেন—হযতো বা অজ্ঞান
হযে পড়ে আছেন।

সেই জীবন্ততাদেব কথা ভেবে অস্থিৰ হযে পঢ়ি। বসে
থাকতে পাবলাম না মৃত্যেব কাছে। উপবে নিচে কোথাও তাঁবা
নেই। মনেব ব্যথায় জলে ঋপ টাপ দিলেন না তো?

বান্নাঘবে ছাৎ কৰে ব্যঞ্জন সম্বৰা দিল—উঁকি মেবে দেখি,
বড বৌদিদি।

কি কবছেন?

বান্ধুসীৰ কাণ্ড দেখ ভাই—

বলে ছোট-বৌদিদিব দিকে অঙ্গুলি নিৰ্দেশ কৰলেন।
ঘবেব একপ্রান্তে পা ছড়িয়ে বসে ছোট-বৌদিদি গোঁয়াসে
খাচ্ছেন তখন। মখেব বড গ্ৰাসটা এক প্ৰবল ধাক্কায় উদবস্থ
কৰে ম্লান হেসে তিনি বললেন, মডা বেব কবলেই শাঁখা ভাঙতে
হবে। মাছ খাওয়া চিবজন্মেব মতো শেষ—

বড়-বৌদিদি অমনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, তা বলে কড়াই-
সুন্ধ টেনে নিবি ? ও যে দশজনের খোবাক ! আমি কি কবি
ভাই—ও-বেলাব জগ্ন ভাজা মাছ আব তো কাজে আসবে না—
তাড়াতাড়ি তাই দিয়ে একটু খোল করে নিচ্ছি ।

সহসা চমকে উঠে ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন, ও কি, নাম-শোনানো
থেমে গেল যে ! নিয়ে যাবে নাকি ? একটু সব্ব কবতে বলা
ভাই, দু গ্রাস খেয়ে আসি । ছোট-বাগ্‌সুইই সব মাটি কবে দিল ।



এই লেখকের

দিল্লি অনেক দূর ‘পুস্তকেব নাম ইঙ্গিতপূর্ণ। স্বাধীনতার দৃশ্য একদা যে দিল্লি চণে ধ্বনি উচ্চারিত হইয়াছিল ভাবভেব পূর্ব দেশ হইতে দেশপ্রেমিক কোরেব বেতাব মুখে, সে ধ্বনি আজ পাঁচমা গিয়াছে বটে—কিন্তু দিল্লি এখনো দুবেই আছে, স্বাধীন দেশের সমৃদ্ধি এখনও আমবা লাভ করি নাই, এখনও প্রকৃত স্বাধীনতা মরীচিকাই বহিষা গিয়াছে। এই পবিত্রস্থিতে গল্পগুলির উপর এক নূতন আলোবপাত হইয়াছে। কিন্তু মনোজবাবু দুঃস্বপ্ন আশাশুভী লেখক, তাই তাহাব গল্পগুলি শেব পথস্ত মনে সকল নৈবাস্ত্রের মধ্যেও একটা জীবনের ধ্বনি বাজিয়া তোলে, মন আনন্দ ভবিষা যায়। গল্পগুলির মধ্যে আগাগোড়াই একটা বিশ্বাসের স্বর, সংযম এবং পবিত্র ত উচ্চ শিল্পস্বভাব — যুগাপ্ত। দুই টাকা।

দুঃখ-নিশার শেষ ৩৮ সং। ‘বর্তমান গল্পসংগহে মনোজ বহুব আধুনিক দৃষ্টির চরম বিকাশ পবিত্র সম্ভব হইল — শনিবাবের চিঠি। ২.

উলু ২৮ সং। ‘অভিভূত কবা ট্যাজেডি গল্প মানান্ত বাবুব গল্পের সঙ্গে বাঁহাদুরী পরিচয় আছে, তাহাদেব কাছে বহুপানি অবশ্যই অভ্যর্থনা পাইব যুগান্তব। ২০

একদা নিশীথ কালে শোভন সচিত্র ৪র্থ সংস্করণ। উপস্থাপনের মধ্যে কচিান বই। ‘হাজকা খোখাতও মনোজ পহব সমগ্র দেখিয়া সবলে নিশ্চিত হইবেন’—শনিবাবের চিঠি। দুই টাকা।

কাচের আকাশ ‘গল্প বলায় মনোজবাবু স্বকীয় ঔশিষ্ট্য আনোচ্য পুস্তকেব সব গল্পগুলিতে পবিত্র। পড়তে পড়তে মন হয়, কে খেন সামনে বসে অনঞ্চল কথা বলে যাচ্ছে— বড় মিষ্টি। ওস্তাদ বাজিয়ে অনেকে হতে পারেন, কিন্তু ‘হাত মিষ্টি’ সবাব ভাগ্যে হয় না। লিপিতে অনেকে পাবেন, কিন্তু মনোজ বাবু মত এমন সহজে মনকে ছোঁবাব ক্ষমতা কম লেখকেবই আছে’—শেখ। দুই টাকা।

দেবীকিশোরী সম্প্রতি ২৮ সং বেবিয়েছে। নানা গোলাগোলে এই বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ দশ বৎসরবিক কাল ছাপা সম্ভব হয় নি। দুই টাকা।

বিপর্যয় বড়মহলে অভিনীত। ‘কোন নাটকে প্রথম পথায়ে ডরী হইবাব জন্তু বে গুণ পাকা লরকার, আনোচ্য নাটকে তাহা সব কিছুই আছে। নানা খাতপাতবতে নাটকের গতি হইয়াছে দ্রুততব, ডাখালণ ফোলাফা ও স্বচ্ছন্দ গতি, ‘বহুদিশাসে বৈচিত্র্য আছে’—আনন্দবাজব। দুই টাকা।

প্লাবন ৪র্থ সং। নাট্যভাবভীতে অভিনীত জনপ্রিয় নাটক। ‘নাটকের সংবেদনশীলতা ও লিপিতাত্ত্ব বসপিপাত্রদেব মনে গভীর খোখাপাত বরিণাছে যুগান্তব। ১১০

বাঁশের কেলা ২য় সং। “The novel unfolds the epic story of India’s struggle for freedom which during the hundred and fifty years of British rule shook out of their peaceful lumber the quiet little village all over the Country.....The author of BHULINAI has added one more feather to his cap”—হিন্দুস্তান ট্যাগার্ড। ২।

ভুলি নাই ২৩শ সং। আধুনিক কালের সর্বাধিক বিক্রীত উপন্যাস। এই বইয়ের চিত্ররূপও অসামান্য সাফল্য লাভ করেছে। দুই টাকা।

ওগা বধু সুন্দরী ৩য় সং। নিখামত প্রেমের উপন্যাস। আগাগোড়া দুই রঙে ছাপা, বিচিত্র প্রচ্ছদপট। উপহারের প্রার্থে কতিপয়ত বট। ২৮।

আগষ্ট, ১৯৪২ ৩য় সং। আগষ্ট-বিপ্লবের পটভূমিকাধরিত বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত স্মরণীয় স্মরণ উপন্যাস। ‘In this volume Monoj Babu has told a few of the human stories which the flame, smoke and blood had engulfed at the time and which he has knit together in an integrated whole’—হিন্দুস্তান ট্যাগার্ড। চার টাকা।

শত্রুপক্ষের ঘোষ ৩য় সং। শত্রুপক্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিবেশ, পরশোত বসতি-বিলস চলে উপর দুর্দর মানুষের জীবন-চিত্র। ‘Sj Monoj Bose has a striking manner of producing atmosphere—of bringing to the reader’s mind the vast alluvial stretches, the mighty rivers in spate, fearless spirits in the passion for fight and the ways of human heart that beat the same through different ages and times’—গম্বুজবাক্স। ৩।

যুগান্তর ২য় সং। ‘শত্রুপক্ষের ঘোষ’ উপন্যাসের বিশেষ সংস্করণ। ফোনোমেগের হাতে ভালভাবে সংস্করণে উপযোগী। দুই টাকা।

মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প ২য় সং। বাছটি বঙ্গ গল্পের সংকলন। একখণ্ড। বইয়ের ভিতর দিয়েই মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্পের সমগ্র গল্পটি প্রচ্ছদে চোখে পড়বে। লেখকের জীবন-বৃত্তি, চর্চা এবং অধ্যাপক জগদীশ হট্টাচার্যের বসন্তকাল ‘ভূমিকা’ বইটিকে প্রস্তাবাবরণ বর্ণনা দিয়েছে। পাঁচ টাকা।

খন্দোত ‘ছোট গল্প’ বলিতে যাওয়া যোয়ায, এখানে ঠিক তাহাই। ছোট এবং গল্প দুইই। প্রচুর চমৎকার গল্প। রস গনীভূত। বীণা হীরকের, খজোতের মিটিমিটি নহে। গল্পলেখক মনোজ বসুর দৃষ্টিতে হলে এ ‘ইপানি গল্পগাঠা’—যুগান্তর। ২।

নরবাঁধ ৪র্থ সং। ‘বাক্য’র আরেক জন শক্তমান কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত মনোজ বসু—‘ভাষার ‘মাপুর’ নামক বড় গল্পটিতে এই বাণ্য-লগনের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা

যেন বাস্তব অনুভবী, তেমনই কাব্যরস সমৃদ্ধ। রোমান্টিক ট্রাজেডী এখানে বাস্তব জীবনেই দেই বৈকল্য ভাব সম্মেলনের অপরূপ কবিত্বভেদে পরিণত হইয়াছে। সে যেমন মধুর তেমনই নির্মল। কোন ভাব নাই, অকল্যাণের অভিধাণ নাই -বস্তুত বাংলা সাহিত্যে ইহার জুড়ি নাই বলিলে অত্যাধিক হয় না। এই প্রজ্ঞে ইহা বলিয়া রাখিতে চাই যে এ গ্রন্থের এই দুইটি গল্প যিনি লিখিয়াছেন, তিনি আর সাহাই লিখুন বা না লিখুন কেবল এই দুইটির জন্ত (আরেকটির নাম নরবীথ) বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাসিদ্ধীদের চক্রে স্থায়ী আসন লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে আসন অতি অল্প তরুণজনই দাবী করিতে পারেন' ঘোষিতলাল নজুমদার বঙ্গবর্নন। দুই টাকা।

পৃথিবী কাদের ? ৩য় সং। নবযুগের বলিষ্ঠতম গল্প। 'It is a departure in the fiction literature of the province'—অমৃতবাজার। দেড় টাকা।

বনমর্মর ৪র্থ সং। 'বে retrospect, চিন্তার গভীরতা এবং মনের সেন্দর্ভাবোধ ষাটিল লে। চিরন্তনের পন্থায় গিয়া পৌছ'ব ত'তা মানাও বহুর আছে'—পরিচয়। আড়াই টাকা।

রাখিবন্ধন 'নূতন প্রভাত' শ্রেষ্ঠ অগ্রিকরা নবীন নাট্যশক্তি। 'বিদেশী শাসকের শ্বেরশাসনর বিরুদ্ধে চর্যার জাতীয় প্রতিরোধের কণ্ঠবন্ধ করিবার উচ্চ দেশীয় ভাবোদারদের সহায়তায় শাসকগোষ্ঠির বর্বর অত্যাচাৰ এবং তাঁহির শ্রেষ্ঠ সম্বানদের নিঃশব্দ হুঃপবরণ ও মর্যচরা আত্মদানের কামিনীকে মলম উপদ্রব করিয়া গট নাটকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে। আন্দোলনের পতিপথে উদ্বাচল নব সৃষ্টিদায়ক ব্যাঙ্গকাব্যী ধর্মোন্মোহিত এই নাটকে হুকৌশল সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। পরিবর্তিত অদৃশ্য প্রাক্তন পদালিত্যের ভাল পরিবর্তনের উপভোগ্য চিত্রটির অপকণ বিজ্ঞান নাটকখানিক আরও আবশ্যিক কবিতা তুলিয়াছে'—বুগ্জন্তর। দেড় টাকা।

নূতন প্রভাত ৫য় সং। 'এই প্রকার সমস্ত লইয়া ও গট ভাবের সমানিদৃশ্য ও সাহসের সঙ্গে লেখা নাটক বাংলাচ পড়ি নাও—স্থনীতি চাট্টাপাখান। 'মানাজবাবু যে নূতন করছেন, তা গতাশ্রিতক নাটকীয় প্রথা নয়—অহীপ্র চৌধুরী। 'এই ধরনের নাটকেরই আমরা কতকাল ধরে প্রত্যাশা করছি'—নরেশ মিত্র। 'আপনাকে যন্তবাদ না দিয়া পারি না—সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে'—নির্মল লু লাহিড়ী। দুই টাকা।

নবীন যাত্রা ২য় সং। 'লক্ষণঃ যাত্রার স্বর পরিসরকে নবীন যাত্রার আদিগত পরিমরে আপাত্তরিচ করা এ লক্ষ্য মানাও বহুর লোনেতেই বুদ্ধি সম্বব'—দেশ। তিন টাকা।

